মহাবিশ্বে মানুষ
পুস্তকমালা

জীববৈচিত্র ও আমাদের ভবিষ্যৎ

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

মহাবিশ্বে মানুষ
পুস্তকমালা

জীববৈচিত্র ও আমাদের ভবিষ্যৎ

লক্ষ লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রাণি ও অন্যান্য জীবের সমন্বয়ে পৃথিবীর যে সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র তার সঙ্গে আমাদের ভাগ্য অবিচ্ছেদ্য ভাবে বাঁধা। এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে যে আমাদের নানা কর্মকাণ্ডের ফলে এই জীববৈচিত্র অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে বিলুপ্ত হচ্ছে। এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলো আজ আমাদেরকে এক নিদারুণ সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। এক দিকে এটি জীববিলুপ্তি যে কত ব্যাপক ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটি উদ্ঘাটন করেছে, অন্য দিকে এর ফলশ্রুতিতে আমাদের অস্তিত্ব কীভাবে বিপন্ন হতে চলেছে সেটি তুলে ধরেছে। এমন ভবিষ্যৎ এড়াতে হলে, আমাদেরকে এখনই অনেক ক্ষেত্রে সাবধান হতে হবে, আর যে ক্ষতি হয়ে গেছে সেটি পূরণও করতে হবে জীব বৈচিত্রকে সুরক্ষা দিয়ে এবং পুনরুদ্ধার করে। এ কাজের জন্য অপরিহার্য হলো সব পর্যায়ে সচেতনতা এবং জীব জগতে বিচিত্র প্রজাতির সহঅবস্থান, প্রতিযোগিতা-সহযোগিতা, ইত্যাদির মাধ্যমে এর সূক্ষ্ম ভারসাম্য সম্পর্কে জ্ঞান ও গবেষণা। জীববৈচিত্র রক্ষায় ব্যক্তি, জাতি ও বিশ্ব পর্যায়ের প্রচেষ্টায় সফল আমাদেরকে হতেই হবে, এবং এ কাজে আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তাটি একান্ত প্রয়োজন। আমরা যাকে উন্নয়ন বলছি তা যদি এই হারে জীববিলুপ্তির কারণ হয়, তা হলে সেটি তো টেকসই হবেইনা বরং তা বিশ্বকে শিগ্‌গির বসবাসের অনুপযুক্ত করে তুলবে।

প্রচ্ছদ ॥ মোবারক হোসেন লিটন

পুস্তকমালা

মহাবিশ্বে মানুষ

ষষ্ঠ বই

জীববৈচিত্র ও আমাদের ভবিষ্যৎ

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

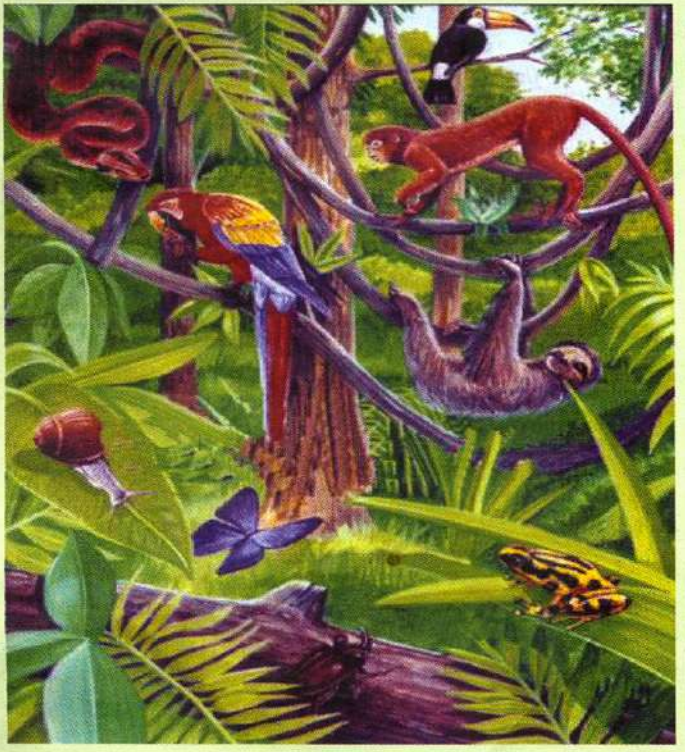

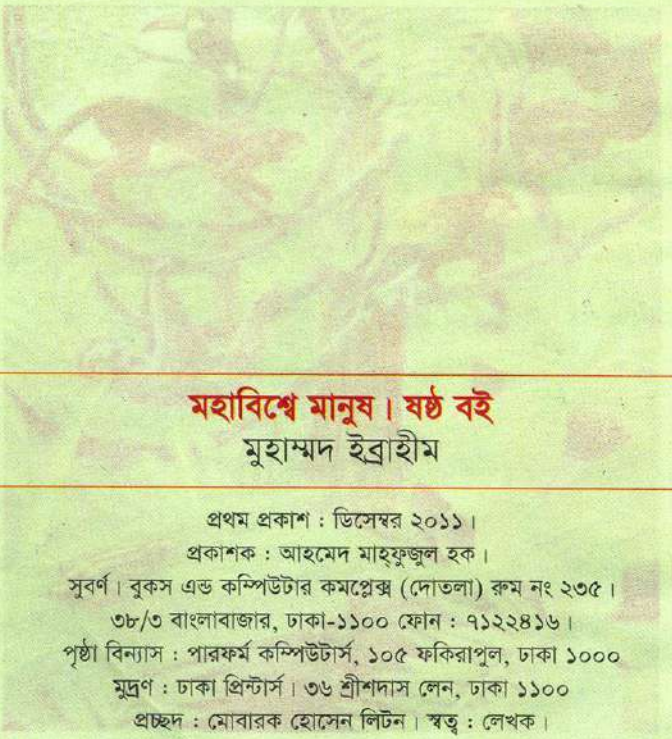

মহাবিশ্বে মানুষ। ষষ্ঠ বই

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১১।
প্রকাশক : আহমেদ মাহ্‌ফুজুল হক।
সুবর্ণ। বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (দোতলা) রুম নং ২৩৫।
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন : ৭১২২৪১৬।
পৃষ্ঠা বিন্যাস : পারফর্ম কম্পিউটার্স, ১০৫ ফকিরাপুল, ঢাকা ১০০০
মুদ্রণ : ঢাকা প্রিন্টার্স। ৩৬ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা ১১০০
প্রচ্ছদ : মোবারক হোসেন লিটন। স্বত্ব : লেখক।

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984 70297 0082-0

উৎসর্গ

যাদের সঙ্গে বিজ্ঞান আলোচনা করে সব সময়
অসীম আনন্দ লাভ করেছি,
যাদের অনুসন্ধিৎসু মন ও স্বপ্নভরা চোখ
সর্বক্ষণ অনুপ্রাণিত করে
যুগে যুগে যারা মহাবিশ্বে মানুষের স্থানটিকে
উজ্জ্বলতর করে তোলার প্রয়াস নিয়েছে, সেই–

তরুণ-তরুণীদেরকে

পুস্তকমালার ভূমিকা

প্রাণিজগতে আমাদের যে প্রজাতি তার বৈজ্ঞানিক নাম নিজেরা দিয়েছি হোমো সেপিয়েন্স অর্থাৎ 'জ্ঞানী মানুষ'। অন্য সব প্রজাতিকে ছাড়িয়ে যে অনন্যতা আমরা লাভ করেছি তার বড় প্রকাশ উচ্চতর চিন্তার ক্ষমতা, এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে মহাবিশ্বকে উদ্ঘাটনের চেষ্টা করার আগ্রহ ও সক্ষমতা। নিজেদের ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে আত্মঅনুসন্ধানও এই উদ্ঘাটন চেষ্টার অন্তর্ভূক্ত। আমরা কারা, কোথা থেকে এসেছি, কেমন করে চিন্তা করি, অন্য সবকিছুর সঙ্গে আমাদের কী রকম সম্পর্ক, ভবিষ্যতে কী সংকট ও কী সম্ভাবনাগুলো আসতে পারে– বিজ্ঞান এ সব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং এখন উত্তরগুলোকে সূক্ষ্মভাবে প্রমাণিত করতে পারছে। সামনে যে তা আরো শাণিত হবে তাও স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। এই পুস্তকমালা এসবকেই সবার জন্য সহজভাবে পরিবেশন করার প্রয়াস নিয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে লেখক এ বিষয়গুলো নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কিছু বিজ্ঞান-বক্তৃতা দিয়েছেন সর্ব-সাধারণের জন্য। 'সবার জন্য সর্বশেষ বিজ্ঞান' নামের এই বক্তৃতাগুলো প্রতি মাসে ঢাকাস্থ বৃটিশ কাউন্সিল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং চ্যানেল আই কর্তৃক টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়েছে। পুস্তকমালার বইগুলো তার ভিত্তিতেই রচিত। একেবারেই সাম্প্রতিক বিজ্ঞান এসব নিয়ে আমাদের জ্ঞানের সীমান্তটি যেখানে এনে দিয়েছে, সকল জটিলতা সত্ত্বেও তাকেই সহজ ভাষায় উপভোগ্য করার চেষ্টা এতে রয়েছে। মহাবিশ্বের ক্রমবিকাশকে বুঝার ও তাতে আত্মঅনুসন্ধানের কিছু স্বাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ও ধরিত্রীর ভবিষ্যতের স্বার্থে আমাদের জীবনভঙ্গির অনেক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাও এর মধ্যে অনিবার্যভাবে এসেছে। সব মিলে পুস্তকমালাটি আগ্রহী সবার জন্য, বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের জন্য, চিন্তার ও আনন্দের খোরাক যোগাবে

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

পুস্তকমালার অন্যান্য বই

মহাবিশ্বের বয়স ও আমাদের মহাজাগতিক শিকড়

চারশত কোটি বছরের পৃথিবী ও প্রাণ

আফ্রিকা থেকে জ্ঞানী আমরা

আমরা কী ভাবে চিন্তা করি

উদ্ঘাটিত ডিএনএ, উৎসারিত সম্ভাবনা

জীববৈচিত্র ও আমাদের ভবিষ্যৎ

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন

নূতন আবাস, নূতন পড়শির খোঁজে

ভূমিকা

বহু বিচিত্র প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রাণি এবং আরো নানা জীবে গড়া এক অতি সমৃদ্ধ জীবজগৎ আমাদের এই পৃথিবীর সম্পদ। আমাদের নিজেদের জীবনও এই জীববৈচিত্রের সঁঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এই জীববৈচিত্র অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে লোপ পাচ্ছে, এর অনেক প্রজাতিই প্রতিনিয়ত চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর জন্য এ এক অপূরণীয় ক্ষতি, আর আমাদের জন্য এটি একটি অশনি সংকেত। জীববৈচিত্র এত নানাভাবে আমাদেরকে পোষণ করছে যে এর অবক্ষয় জীবনযাত্রাকে ক্রমেই সমস্যাসংকুল করে তুলে আমাদের ভবিষ্যৎকে সংকটাপন্ন করে তুলবে। অথচ বর্তমান এই জীব বিলুপ্তির সবচেয়ে বড় কারণ আমরা মানুষরা। আমাদের বসত বিস্তৃতি, নগরায়ণ, কৃষি সম্প্রসারণ, শিল্প গড়া, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ইত্যাদি লাগামহীন ভাবে করার ফলে এটি ঘটছে। এভাবে আমরা অন্যান্য জীবের বসতকে সংকুচিত করে ফেলছি, দূষণ সৃষ্টি করে তাদের টিকে থাকাটি অসম্ভব করে তুলছি, এবং নিজেদের ভোগে বেপরোয়াভাবে মেরে ফেলে তাদের বংশ ধ্বংস করছি। এখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি– পরিচিত অনেক প্রাণি ও উদ্ভিদ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, এবং আরো অনেকগুলো অনিবার্যভাবে বিলুপ্তির পথে রয়েছে। যে সব বিলুপ্তি প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাচ্ছিনা বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে তারও একটি চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরতে পারছেন। সেটিই খুবই আশংকাজনক।

জীব বিলুপ্তির পরিমাণ ও প্রক্রিয়া উদ্ঘাটন করা সহজ কাজ নয়। এমনকি পৃথিবীতে অপুষ্পক, সপুষ্পক কত রকমের উদ্ভিদ; কীটপতঙ্গ, উভচর, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী ইত্যাদি মিলে কত রকম প্রাণি; আর ফাঙ্গাস, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি কত আছে সেসব অনেকটা শুধু গাণিতিক মডেলিং এর মাধ্যমেই আমরা জানতে পারছি। কারণ এর একটি অংশই শুধু প্রত্যক্ষ চিনে নেয়ার মাধ্যমে তালিকাভুক্তি করা সম্ভব হয়েছে। বিলুপ্তির প্রক্রিয়াকে থামাতে হলে জীবজগতে বিচিত্র প্রজাতির জীবের সহঅবস্থান, প্রতিযোগিতা-সহযোগিতা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের ভারসাম্যের প্রকৃতি সূক্ষ্ম ভাবে বুঝার জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জ্ঞানের কোন বিকল্প নেই। এ সম্পর্কে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও পরীক্ষণ সমূহের ভিত্তিতে মানুষের সৃষ্ট বর্তমান জীব-বিলুপ্তির স্বরূপগুলো বুঝার চেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে।

বিশ্ব সমাজ এখন একমত যে জীববৈচিত্র রক্ষার জন্য ব্যক্তি, জাতি, ও বিশ্ব পর্যায়ে সম্ভাব্য সবকিছু করতে হবে। আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এই দিকটি বিবেচনায় না রাখলে টেকসই উন্নয়নতো হবেই না, বরং ভবিষ্যতে পৃথিবীটি ক্রমেই আমাদের বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে। আমাদের প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে, বিশেষ করে জীব সম্পদ ব্যবহারের মাত্রাকে এজন্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বিশ্বজনীন

সমঝোতার মাধ্যমে। এর মধ্যে জীববৈচিত্রকে রক্ষায় স্থাপন করা হচ্ছে ছোট বড় অনেক সংরক্ষিত এলাকা। সেই সঙ্গে গড়ে তোলা হচ্ছে দেশে দেশে এসব এলাকাকে সংযোগকারী পরিসর এবং মেগাকরিডর। বিলুপ্তির কাছাকাছি চলে যাচ্ছে এমন প্রাণি ও উদ্ভিদগুলোর সযত্ন লালন ও বংশবৃদ্ধির দুরূহ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাও আমাদের উদ্যোগের অংশ হচ্ছে।

বিলুপ্তির ক্ষেত্রে সব চেয়ে আশংকার জায়গাগুলো হচ্ছে জীববৈচিত্রের আকর হিসাবে পরিচিত কিছু জীব পরিবেশ– বাদল বন, নদী মোহনার খাড়ি, প্রবাল প্রাচীর ইত্যাদি। জীববৈচিত্রকে রক্ষার বড় লড়াইগুলো চলতে হবে সেখানে। সেখানে এবং আমাদের আশেপাশের সর্বত্রই এই লড়াইটি আমরা কীভাবে করা উচিত তার নানা দিক নিয়েও আলোচনার চেষ্টা রয়েছে এই বইতে।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

সূচিপত্র

জীববৈচিত্র নিয়ে উদ্বেগ কেন ৫
জীববৈচিত্রের মূল্য ১৪
পড়শি বসত করে ২৮
গবেষণার কিছু উপায় ৪৬
দলে সদস্য কত ৫৩
প্রতিযোগিতা, সহযোগিতা ৬১
জীবসমাজে ভারসাম্য ৭৪
বাদল বনঃ জীববৈচিত্রের আকর ৮৩
খাড়ি ও প্রবালঃ জীববৈচিত্রের অন্য আকর ৮২
মানবসৃষ্ট জীব বিলুপ্তির নানা কাহিনী ৯৫
জীববৈচিত্র রক্ষায় জীব পরিবেশ গড়া ১০২
বিপন্ন প্রজাতির লালন পালন ১২৩
ব্যক্তির কর্তব্য, বিশ্বের কর্তব্য ১২২
প্রশ্নোত্তর ১৩১

জীববৈচিত্র ও আমাদের ভবিষ্যৎ

জীববৈচিত্র নিয়ে উদ্বেগ কেন

ওয়ালডেন: প্রকৃতির সঙ্গে বসবাস

বিখ্যাত পদার্থবিদ ষ্টিফেন হকিংস সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন মানুষকে হয়তো কোন রকমে শ'দুয়েক বছর পৃথিবীর পরিবেশ ধ্বংসকে ঠেকিয়ে রেখে পৃথিবীতেই বাস করতে হবে। এর মধ্যে প্রয়োজনে আমরা সুবিধাজনক অন্য কোন গ্রহ-উপগ্রহে চলে যাওয়ার ক্ষমতা অর্জন করবো। এটি যে পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের আচরণের সুস্থতা সম্বন্ধে কত বড় অনাস্থা তা বলাই বাহুল্য। ওভাবে অন্যত্র চলে হয়তো আমরা যেতে পারবো, কিন্তু তা কী রকমের জীবন যাপনের জন্য? পৃথিবীর সবুজ প্রকৃতি আর আমাদের সাথী জীববৈচিত্রের বাইরে আমাদের নিজেদের অস্তিত্বটির কী ধরনের মূল্য থাকবে? আজ এই জীববৈচিত্রের অবক্ষয় ঘটছে আমাদের হাতেই। এর ফলে আমাদের নিজেদের ভবিষ্যত কী হবে সে কথাটি কি ভাবছি ?

বিখ্যাত আমেরিকান লেখক ও দার্শনিক হেনরি ডেভিড থ্যুরো ওয়ালডেন হ্রদের পারে পরিপূর্ণ ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে বসবাসের একটি এক্সপেরিমেন্ট নিজের উপর করেছিলেন। এটি তিনি মানুষের ভবিষ্যতের কথা ভেবে করেননি। বরং তাঁর কাছে মনে হয়েছিলো প্রকৃতির অন্যান্য সব জীব, সব সুন্দর উপাদানের সঙ্গে মিশে গিয়ে চরম সারল্যের মধ্যে থাকতে পারাটাই পরিপূর্ণ সুখের জীবন। ১৮৪৫ থেকে শুরু করে দু'বছর তিনি সেখানে সেভাবে থেকেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসে বনে ঘেরা ছোট ওয়ালডেন হ্রদের পারে এভাবে বেশ কিছুদিন কাটানোর কাহিনী নিয়েই তাঁর চিরন্তন জনপ্রিয় বই 'ওয়ালডেন'। এখানে তিনি নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন একটি নেহাৎ চলনসই গোছের কাঠের কুটির। এর কাছাকাছি বনের ফাঁকে একটি জায়গায় নিজের দরকারি শস্যগুলো চাষ করে ফলিয়ে নিয়েছেন, আর হ্রদে মাছ ধরেছেন, ঠিক যতটুকু দরকার ততটুকু। সময় কেটেছে ওখানকার জীববৈচিত্রের সঙ্গে মেলামেশা উপভোগ করে, আর কখনো বা বই পড়ে ও লেখালেখি করে।

বীচ, হিকরি, রেড ম্যাপল, ওক এসব প্রাচীন হার্ড উডের বৃক্ষ ওখানে ঘন বিন্যাসে ছিল চারিদিকের পাইন বনের বুক চিরে। ইতোমধ্যে অবশ্য আমেরিকায় বন বিনষ্টি যথেষ্ট শুরু হয়ে গিয়েছিল– রেল রাস্তা ওখানে থেকে খুব দূরে ছিলনা। রেল আর শিল্পের চাহিদায় প্রচুর কাঠ পুড়তো। তারপরও অবশ্য ছিল জমকালো বন। লতা গুল্মের সমারোহে হ্রদের পারে টলটলে পানির ওপর ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতেন থ্যুরো। মাছ, ব্যাং, কচ্ছপ এদের সঙ্গে

রীতিমত ভাব হয়ে গিয়েছিল। পানির উপর চিক চিক করে যে পোকাগুলো ছুটাছুটি করে তাদের সঙ্গেও। বনমুরগিটি যখন তার বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে হেলেদুলে আসতো তাদের অভ্যর্থনা করতে তিনি তৎপর থাকতেন। আবার মৌসুমের সময় বড়সড় এক সারস এসে হ্রদের ঠিক ঐ জায়গায় নামতো, আর তিনি ওর সঙ্গে জড়াজড়ি করে সাঁতার কাটতেন। কুটিরের ভেতরে নিত্য সঙ্গীদের মধ্যে ছিল ইঁদুরটা– তার সঙ্গেও সময় কাটাতেন তিনি। একবার তো লাল পিঁপড়ার দলের সঙ্গে কালো পিঁপড়া দলের একটানা মরণপণ যুদ্ধ দেখলেন বহুক্ষণ ধরে। এভাবেই কেটেছে দুটি বছর যার স্বাদ ওয়ালডেন বইটির সুবাদে আমরাও পেয়েছি।

ওয়ালড্রেন হ্রদ বর্তমানে

ঠিক ওভাবে না হলেও থ্যুরোর মতো প্রকৃতি প্রেমিকরা কিন্তু বিরল নয়। তখনো ছিলনা, এখনো বিরল নয়। আর এই প্রকৃতি প্রেমিকরাই এক রকম নেতৃত্ব দিচ্ছেন আজকের জীববৈচিত্র বিপন্ন হবার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। অবশ্য তাঁরা এখন শুধু কিছু একক ব্যক্তিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। বেশ কিছু বড় বড় প্রতিষ্ঠান, অনেক ব্যাপক আয়োজন নিয়ে জীববৈচিত্রের উপর নজর রাখছে, তার উপর কাজ করছে– কোন কোনটি বিশ্বজোড়া তৎপরতার মাধ্যমে। তাদের কারণেই সঠিক পরিস্থিতিটি আমরা জানতে পারছি। জীব জগতে বৈচিত্র আমরা যতটা ভাবি তার চেয়েও অনেক বেশি। আর ওটিই আমাদের পৃথিবীকে নানা ভাবে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু যে রকম খবর নিত্য আসছে, ভবিষ্যতের যে ভয়াবহ

চিত্র বুঝা যাচ্ছে, তাতে শংকিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে– জীববৈচিত্র নিয়ে এবং সে কারণে আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়েও। জীবের প্রজাতিগুলো আমাদের কারণে ক্রমাগত বিলুপ্ত হচ্ছে, অনেকগুলো নিশ্চিত বিলুপ্তির পথে রয়েছে। ছোট বড় অনেক ধারার জীব অবধারিত ভাবে প্রথমে স্থানীয় ভাবে এক এক এলাকায় কমে যাচ্ছে, পরে সেখানে বিলুপ্ত হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে দুনিয়ার কোথাও তারা আর নাই। জীব জগতের এক একটি প্রজাতি এভাবে চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে। এরা হারিয়ে গেলে কী ক্ষতি তা আমরা একটু পরেই দেখবো।

জীব প্রজাতি আছে কত, হারাচ্ছি কত

দুনিয়াতে কত প্রজাতির জীব আছে, এই প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। যেই হারে একেবারে নূতন নূতন প্রজাতি অতীতে মানুষের জানার আওতায় এসেছে এবং এখনো আসছে, তাতে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত যে যত প্রজাতির কথা জানা রয়েছে তার থেকে অনেক বেশি অজানা রয়ে গেছে। তবুও আমাদের আলোচনাটি করতে হবে জানা জীবগুলো নিয়ে, যেগুলো মানুষ লক্ষ্য করেছে, বিজ্ঞানীরাও বৈজ্ঞানিক ভাবে নাম দিয়েছেন, তালিকাভুক্ত করেছেন। এদের জীবন ও পরিণতি নিয়ে আমাদের অধিকাংশ আলোচনা অজানাগুলোর উপরেও প্রযোজ্য না হবার কোন কারণ নাই।

মোটের উপর সব রকম জীব মিলিয়ে সর্বাধুনিক হিসাবে আমাদের জানা প্রজাতির সংখ্যা হলো সাড়ে ১৭ লক্ষের মত। এর মধ্যে ১০ লক্ষই হলো কীট-পতঙ্গ। কীট-পতঙ্গই আমাদের জীববৈচিত্রের প্রধান অংশ। যেমন বাদল বনগুলোতে শুধু পিঁপড়াই রয়েছে ১০ হাজার রকম প্রজাতিরও বেশি। জীববৈচিত্রে এর পরের স্থান হলো সপুষ্পক উদ্ভিদের– যে সব উদ্ভিদের ফুল-ফল হয়। এদের প্রজাতির সংখ্যা আড়াই লক্ষ। সে তুলনায় অপুষ্পক উদ্ভিদের প্রজাতির সংখ্যা কম– ৩০ হাজার। ঐ রকম বড় সংখ্যায় রয়েছে প্রায় এক লক্ষ প্রজাতির ফাঙ্গাস এবং এক লক্ষ প্রজাতির ভাইরাস, এবং এমিবা ইত্যাদি ধরনের প্রোটোজায়া ৬০ হাজার। ব্যাকটেরিয়ার জানা প্রজাতি সংখ্যাটিও এর খুব বেশি হবেনা। প্রাণির মধ্যে মাছের প্রজাতি বেশি– ২৮ হাজার। পাখি (১০ হাজার), সরীসৃপ (৮ হাজার), উভচর (সাড়ে পাঁচ হাজার) – এদের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি বেশি কিন্তু তাদের প্রজাতিবৈচিত্র তেমন নয়। আর আমরা নিজেরা যে গোষ্ঠির, এবং অনেক ক্ষেত্রে শরীরের বড় আকারের কারণে যে গোষ্ঠির উপস্থিতি আমরা বেশি টের পাই, সেই স্তন্যপায়ী রয়েছে মাত্র ৫ হাজার প্রজাতির।

যে সব জীবপ্রজাতির কথা আমাদের জানা রয়েছে, তার তালিকায় বছরে গড়ে প্রায় ১৬ হাজার প্রজাতি যোগ হচ্ছে। নূতন নূতন বিভিন্ন প্রবণতার ভিত্তিতে

জীববৈচিত্র

গাণিতিক মডেলগুলো অজানা প্রজাতিরও কিছু সম্ভাব্য সংখ্যা দাঁড় করাচ্ছে। তাতে জানা-অজানা মিলে দুনিয়ায় জীববৈচিত্র যে অন্তত ৫০ লক্ষ প্রজাতির বেশি তা নির্ঘাৎ বলা যায়। অনেকে তার চেয়েও অনেক বেশি প্রজাতি রয়েছে বলে মনে করেন।

আমরা যদি জীব বিবর্তনের ইতিহাস দেখি তা হলে দেখি বহু কোটি বছর ধরে অনেক নূতন প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছে, সেই সঙ্গে অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে। এটি বিবর্তনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তাছাড়া গত ৫৫ কোটি বছরের কথা আমরা জানি যার দশ-বিশ কোটি বছর পর পর পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবর্তনে অথবা দৈব দুর্বিপাকে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে অস্বাভাবিক ভাবে জীব বৈচিত্রের একটি বড় অংশের বিলুপ্তি ঘটেছে। সেগুলোকে আমরা গণবিলুপ্তি বলেছি। এখন আশংকাটি হচ্ছে বিজ্ঞানীরা বলছেন এবার প্রাকৃতিক কারণে নয় মানুষের আচরণের ফলে কয়েক হাজার বছর ধরে ঐ ভাবে গণ হারেই জীব বিলুপ্তি ঘটছে, এবং তা দ্রুত বেড়ে চলেছে। কেন তাঁরা এটি বলছেন? এর কারণ বছরে সাধারণ বিবর্তনের নিয়মে যেখানে মাত্র তিনটি থেকে ত্রিশটি প্রজাতি বিলুপ্ত হবার কথা সেখানে এখন হচ্ছে ১৮ হাজার থেকে ৭৫ হাজার প্রজাতির বিলুপ্তি, যার বিলুপ্তি প্রক্রিয়াকে মানুষের জীবন যাপন, আচরণ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত বলে দেখা যাচ্ছে। গণবিলুপ্তির একটি সংজ্ঞা হিসাবে ধরা হয় ৪০/৫০ বছরে ১০

লক্ষ প্রজাতির বিলুপ্তি। বিজ্ঞানীদের মডেলিং দেখা যাচ্ছে সাম্প্রতিককালে বিলুপ্তিটি এই হারেই হচ্ছে। কাজেই এটিই হলো সার্বিক পরিস্থিতি– দ্রুত জীববৈচিত্র হারাবার পরিস্থিতি। আর আমরা যে সব জীবের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত তাদেরকেও এক একটি করে অস্বাভাবিক দ্রুততায় বিলুপ্ত হতে আমরা দেখছি। সবাই খেয়াল না করলেও প্রকৃতি প্রেমিকরা, প্রকৃতিবিদরা এটি খুবই লক্ষ্য করছেন– এক রকম চোখের সামনেই তা ঘটতে দেখছেন। দেখা যাচ্ছে সংকট ঘনীভূত হচ্ছে। যে সব অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে মানুষ জীববৈচিত্রকে বিলুপ্তির মুখে ঠেলে দিচ্ছে, সেই কারণগুলো ক্রমে বাড়ছে। আমরা নিজের জন্য জীবসম্পদ ক্রমেই বেশি বেশি করে অতি-আহরণ করছি, তাদের বসত নষ্ট করে নিজেদের কাজে লাগাচ্ছি, আমাদের দূষণ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জীবন রক্ষা অসম্ভব করে তুলছি। মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এমনটি করছে। কিন্তু এখন এগুলো চরমে চলে গেছে।

জীব বিলুপ্তির ভাবভঙ্গি

কোন একটি প্রজাতি বিলুপ্ত হলো কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়াটি কিন্তু সহজ কাজ নয়। প্রজাতিটি যদি সব সময় চোখের সামনে থাকার মত জীব না হয় তা হলে এটি আরো কঠিন। এজন্য এ সম্পর্কে কতগুলো সাধারণ নিয়ম বানিয়ে নেয়া হয়েছে। এরকম একটি নিয়ম হলো কোন একটি প্রজাতির একটি সদস্যকেও যদি ৫০ বছর ধরে সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুজি করে না পাওয়া যায় তা হলে এটিকে বিলুপ্ত বলে ঘোষণা করা হয়। আর একটি নিয়ম হলো বিলুপ্তির কাছাকাছি চলে এসেছে এরকম প্রজাতির শেষ যে ক'টি সদস্য বেঁচে রয়েছে বলে জানা রয়েছে সেগুলো যদি নূতন কোন বাচ্চা না রেখে মরে যায় সেক্ষেত্রেও প্রজাতিটিকে বিলুপ্ত মনে করতে হবে। অবশ্য এসব কিছু প্রত্যক্ষভাবে নিশ্চিত করা শুধু বিরল ক্ষেত্রেই সম্ভব। পরোক্ষ নানা সাক্ষ্য প্রমাণ থেকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিলুপ্তির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে মাঠ পর্যায়ে গবেষণার মাধ্যমে প্রজাতিটির সদস্য সংখ্যা হ্রাসের হার নির্ণয়, – অতীত হার, বর্তমান হার, ভবিষ্যৎ প্রবণতা ইত্যাদি নির্ণয়। আর একটি পদ্ধতি হলো কম্পিউটার-নির্ভর গাণিতিক মডেলিং এর মাধ্যমে। গাণিতিক মডেল আসলে জীববৈচিত্র সম্পর্কে যে সব সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে তার ভিত্তিতেই তৈরি হয়। যেমন পরিবেশের সঙ্গে, পুরো জীব সমাজের সঙ্গে, বিভিন্ন জীবের যে সব

হুমকিতে সামুদ্রিক কচ্ছপ

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক রয়েছে সেগুলো এসব তত্ত্বের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। তখন ঐ প্রজাতি ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য কিছু সম্পর্কে সর্বশেষ পরিমাপ করা উপাত্তগুলো মডেলে দিলে মডেল ঐ প্রজাতির পরিস্থিতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিতে পারে, বা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। এই জন্যই জীববৈচিত্রের নানা দিকের উপর সূক্ষ্ম গবেষণা ও নির্ভরযোগ্য তত্ত্ব থাকা জরুরী।

একটি প্রজাতি হঠাৎ করে বিলুপ্ত হয়না। বহুদিন থেকে তার সদস্য সংখ্যা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বিলুপ্তির দিকে স্পষ্ট অগ্রসর হলে একে প্রথমে 'হুমকিতে' (থ্রীটেন্ড) আছে এমন জীবের তালিকায় আনা হয়। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে যার সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে সেই জীবটিকে এই শ্রেণীভুক্ত করা হয়। সেটি একটি প্রজাতি হতে পারে, বা তার অন্তর্ভূক্ত কোন উপ-প্রজাতি (সাব-স্পেসিস) হতে পারে। তারপর বিলুপ্তি প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠলে একে আনা হয় 'বিপন্ন' (এন্ডেন্জারড) জীবের তালিকায়। এরকম পর্যায়গুলোতে চলে যাবার পরও নানা রকম উদ্যোগ নিয়ে প্রজাতিকে রক্ষা করা যেতে পারে– যেমন এমনি উদ্যোগের ফলে হুমকিতে থাকা জীব শেষ পর্যন্ত বিপন্ন নাও হতে পারে। ওভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করার এটিই সুফল– একে বাঁচাবার শেষ চেষ্টাগুলো অন্তত জরুরী ভিত্তিতে নেয়া যায়।

আসলে যে সাড়ে ১৭ লক্ষ প্রজাতির জীবের খবর আমরা জানি তার মধ্যে অনেকগুলোই এখন বিলুপ্তির পথে রয়েছে। সেগুলোর অধিকাংশ সম্পর্কে সামগ্রিক প্রবণতার কথাই শুধু সাধারণত জানা যায়– যেমন রেইন ফরেষ্ট বা বাদল বন কতখানি ধ্বংস হলে কী ধরনের প্রজাতি কী হারে হুমকির সম্মুখীন হবে তা এখন বলা যাচ্ছে। তবে সাধারণত আকারে বড়, আমাদের অধিক পরিচিত, বা আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এমন জীবের ক্ষেত্রে বিলুপ্তির ঝুঁকিতে থাকা এক একটি প্রজাতিকে আলাদাভাবে সতর্ক অনুসরণ করা যায়, এবং তা করা হচ্ছে।

ওরকম ঝুঁকিগুলো নানা ভাবে বুঝা যায়। সংখ্যা দ্রুত কমে গেলেতো বুঝা যায়ই, ওরকম কমার কারণগুলো স্পষ্ট হলেও বুঝা যায়। প্রজননের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়া বা আগ্রহ না থাকা কোন প্রজাতির ক্ষেত্রে এরকম লক্ষণ হতে পারে– যেমন হয়েছে জায়ান্ট পাণ্ডা, নীল তিমি, শ্বেত ভল্লুক, কন্ডোর পাখি ইত্যাদির ক্ষেত্রে। বিশেষ খাদ্যের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতাও বিলুপ্তি ডেকে আনে যেমন জায়ান্ট পাণ্ডা (বাঁশ পাতা), নীল তিমি (ক্ষুদ্র চিংড়ি জাতীয় ক্রিল), কোয়ালা (ইউক্যালিপটাস পাতা)। খাদ্য চেইনে সবার উপর থাকলেও ঝুঁকি সৃষ্টি হয় যেমন বাঘ, বল্ড ঈগল। ক্রমাগত বসত সংকুচিত হতে থাকলেও এমনটি হয় যেমন ওরাং ওটাং, গরিলা ইত্যাদি। বিশেষ বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়া জীবও ঝুঁকিতে থাকে– যেমন প্যাসেঞ্জার কবুতর নামের পাখির অতিরিক্ত বড় কলোনি তৈরি করা, নীল তিমির দীর্ঘ অভিবাসনে আন্টার্কটিক যাত্রা, লালমাথা কাঠ ঠোকরার গাড়ির আগে আগে চলার অভ্যাস। অতীতে যে কারণেই এই অভ্যাসগুলোর সৃষ্টি হোক না কেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এগুলো ঐ প্রাণি-প্রজাতির টিকে থাকার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ঝুঁকির সৃষ্টি করছে।

জীববৈচিত্র নিয়ে কাজ করছে এমন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো হুমকিতে থাকা, বিপন্ন হয়ে যাওয়া এবং বিলুপ্ত হওয়া জীবপ্রজাতিগুলো সম্পর্কে কিছু দিন পর পর তালিকা প্রকাশ করে। তবে চূড়ান্ত বিলুপ্তিতে পৌঁছার আগেও অন্য পর্যায়ের কিছু বিলুপ্তিও এর অশনি সংকেত দিতে পারে। যেমন 'স্থানীয় বিলুপ্তি'। যেখানে এক

বিপন্ন জায়ান্ট পান্ডা

সময় প্রজাতিটি প্রচুর ছিল সেই অঞ্চলে এটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াটি খারাপ লক্ষণ। অন্য জায়গায় এটি এখনো টিকে থাকলে একই ধরনের কারণে সেখানেও সংকট দেখা দিতে পারে। আর একটি পরিস্থিতি দেখা দিয়ে থাকে যেটিও শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত বিলুপ্তি ডেকে আনতে পারে। একে বলা যায় 'জীব পারিবেশিক বিলুপ্তি'। এক্ষেত্রে প্রজাতিটি এখনো বিলুপ্ত হয়ে যায়নি বটে কিন্তু যে অল্প সংখ্যায় এরা আছে– তাতে নিজের জীবপরিবেশে (ইকোসিষ্টেমে) তার নির্ধারিত ভূমিকাটি এটি আর পালন করতে পারছেনা। কোন জীব কোথাও একা থাকেনা। তাকে থাকতে হয় অন্য অনেক জীবের সঙ্গে একত্রে এক একটি ইকোসিস্টেম বা জীব-পরিবেশে। সেখানে তাকে ঐ পরিবেশের সঙ্গে দেয়া নেয়ার একটি ভূমিকায় থাকতে হয়। এখানে যে সব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রজাতিটি আগে টিকে ছিল, ভাল ছিল, ঐ ভূমিকাটি পালন না করতে পারার ফলে সেই পরিস্থিতি আর থাকেনা। ফলে এর ইতোমধ্যে ক্ষীণ সংখ্যা ক্রমে আরো ক্ষীণ হয়ে যায়– এবং অবশেষে এটি বিলুপ্তির দিকে যায়। যাকে আমরা চূড়ান্ত বিলুপ্তি বলছি সেটি

একেবারেই ফিরে না আসতে পারার অবস্থা। একবার তা ঘটলে ঐ প্রজাতি আর কোন দিন পাওয়া যাবেনা, এটি তার পরিসমাপ্তি– জৈবিক বিলুপ্তি।

ডোডো: কয়েক শত বছর আগে বিলুপ্ত হয়েছে

জীববৈচিত্রের মূল্য

বিয়োগান্ত কাহিনীগুলো

২০১০ সালে 'সায়েন্স' পত্রিকায় প্রকাশিত এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে অন্তত গত আট বছরে জীব বৈচিত্র অবক্ষয়ের হার দ্রুততর বেগে বেড়েছে। একে থামাতে আমাদের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। বিলুপ্তির হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়ে আনতে ২০০২ সালে বিশ্ব সমঝোতার মাধ্যমে কিছু লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছিল ২০১০ সালের জন্য। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সেটি মোটেই পূরণ হয়নি। বরং প্রজাতির সংখ্যা, তাদের আবাস স্থলের পরিস্থিতিসহ এ সম্পর্কে দিগদর্শক বিভিন্ন সূচকে আরো অবনতি ঘটেছে।

২০০৭ সালে জীববৈচিত্র সম্পর্কে গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান আই ইউ সি এন-এর (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব কনজারভেশন অব নেচার) প্রতিবেদনে জীববৈচিত্রের সাম্প্রতিক অবনতির আরো কিছু বিস্তারিত চিত্র পাওয়া গিয়েছিল। এতে দেখা গেছে স্তন্যপায়ীদের এক তৃতীয়াংশ প্রজাতিই বিলুপ্তির হুমকিতে রয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে করুণ অবস্থা হলো সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীদের– তিমি, ডলফিন ইত্যাদি, এবং প্রাইমেটদের– যেমন বানর, শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাংওটাং। এদের অনেকে খুব দ্রুত বিলুপ্তির পথে চলে যাচ্ছে। আকাশের স্তন্যপায়ী বাদুড়ের প্রজাতিগুলোরও একই অবস্থা। ঐ একই প্রতিবেদনে ৪৪ হাজার বড় প্রজাতির উপর গবেষণায় দেখা গেছে যে এদের ৪০ শতাংশই বিলুপ্তির হুমকিতে রয়েছে। তার মধ্যে তিন হাজার প্রজাতির বিলুপ্তি একেবারেই অবশ্যম্ভাবী। আই ইউ সি এন-এর দশ বছর আগের প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছিল তখন হুমকিতে ছিল ২৫% স্তন্যপায়ী, ১১% পাখি, ২০% সরীসৃপ, ২৫% উভচর, ৩৪% মাছ আর ১২% উদ্ভিদ। এর মধ্যে সচেতনতা বাড়লেও এবং প্রতিকারের কিছু কিছু উদ্যোগ নেয়া হলেও, স্পষ্টত অবস্থার আরো অবনতি হয়েছে।

সদ্য হারিয়ে যাওয়া প্রজাতি
সাদাঠোঁট কাঠঠোকরা

অবশ্য স্বীকার করতে হবে জীববৈচিত্র সম্পর্কে জ্ঞান এবং তৎপরতা বাড়ছে। হয়তো এর ফলেই শিগ্‌গির একটি পরিবর্তন আসবে– বিয়োগান্ত কাহিনীগুলোর প্রাচুর্য কমে আসবে। স্বাভাবিক ভাবেই বড় বড়, চোখে পড়বার মতো বিশিষ্ট প্রাণিগুলোর উপরেই তৎপরতা বেশি, যদিও ছোট-বড় এমন কি ক্ষুদ্র অণুজীবের বিলুপ্তির দুঃসংবাদ। ২০১০ সালকে জাতিসংঘ 'জীববৈচিত্র বছর' ঘোষণা করেছে। তৎপরতার উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় ২০১০ সালেই আমাদের অঞ্চলে হয়ে গেল প্রথম এশীয় বাঘ সম্মেলন। এতে বাংলাদেশ সহ তেরটি দেশের বিশেষজ্ঞ ও নীতি নির্ধারকরা উপস্থিত থেকে বাঘের পরিস্থিতির খাতিয়ান নিয়েছেন। দেশগুলো প্রধানত এশিয়ার বাঘ অঞ্চল– দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায়। সর্বশেষ শুমারি অনুযায়ী এই সব ক'টা দেশ মিলে বাঘ এখন অবশিষ্ট আছে মাত্র ৩,২০০টি। দেখা গেছে একমাত্র মেকং বদ্বীপ অঞ্চলেই গত বার বছরে বাঘ হ্রাস পেয়েছে ৭০%। একশ বছর আগেও এখানে বাঘের সংখ্যা লক্ষাধিক ছিল। এই গতিতে হ্রাস পেলে শূন্যের কোঠায় পৌঁছতে বেশি বাকি থাকবেনা। আর নিজের জীব-পরিবেশে বাঘের স্থানটি এমন যে তার সংখ্যা-হ্রাস ও বিলুপ্তি জীব পারিবেশিক ভারসাম্যে দারুণ বিপত্তি ঘটাবে। বাঘের আধুনিক নয়টি উপ-প্রজাতির মধ্যে চারটি সাম্প্রতিক কালেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন শুধু বাকি ছয়টির কথা বলা হচ্ছে, অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে।

বাঘের মত এরকম কাহিনী আরো অসংখ্য প্রজাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে বিলুপ্তির বিয়োগান্ত কাহিনী নিয়ে সব সময় যে শুধু বড় বড় প্রতিষ্ঠান ও বড় বড় সম্মেলনের উদ্বেগ দেখা যায় তা কিন্তু মোটেই নয়। সচেতনতার আসল পদাতিক সৈনিকরা হলেন প্রকৃতিবিদরা, প্রকৃতি প্রেমিকরা। তাঁরা সব সময় বাঘের মত বড় ও রাজকীয়দের চিন্তা করছেননা, ছোট নিরীহদের চিন্তাও করছেন। যেমন ধরা যাক সেই কয়েকজন পাখি প্রেমিকদের কথা যাঁরা বিলুপ্তির পথে একটি পাখি সাদা-ঠোঁট কাঠ ঠোকরার পেছনে কাটিয়েছেন বছরের পর বছর। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে কিউবা প্রভৃতি দেশে এটি এক সময় দেখা যেত। ১৮০৮ সালেও একজন পক্ষীবিদের নজর কেড়েছে এভাবে– ''অন্যান্য কাঠ ঠোকরারা যেখানে ফলের বাগান, ঝোপ গাছ, বেড়ার খাম্বা, মরা গুড়ি যেখানে যা পাচ্ছে ঠুকরিয়ে চলছে, এটি সেখানে রাজকীয় শিকারির মতো বনের উচ্চতম গাছগুলোই শুধু বেছে নেয়। অন্যদের চেয়ে এদের আত্মসম্মান বোধ খুব স্পষ্ট।" ১৯৩০ এর দশকে এসে এই পাখি দূরে দূরে থাকা মুষ্টিমেয় কয়েকটিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। প্যাটারসন নামে একজন পক্ষীবিদ এর পেছনে এমন লেগে ছিলেন যে ১৯৯৬ সালে নিজে মারা যাওয়ার এক বছর আগে বলে গিয়েছিলেন যে তিনি

প্রায় নিশ্চিত যে এটি আর নাই। তারপরও তাঁর সঙ্গী সাথীরা আশা ছাড়েননি, সম্ভাব্য অনেক দেশে খুঁজে বেড়িয়েছেন। অবশেষে আরো এক বছর পর আইইউ সিএন চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়েছে যে এটি বিলুপ্ত হয়েছে।

জীববৈচিত্রের সাধারণ আর্থিক মূল্য

ঐ সাদা ঠোঁট কাঠ ঠোকরার পেছনে যে ক'জন পক্ষী প্রেমিক ছুটাছুটি করেছেন তাঁরা এর আর্থিক মূল্যের কথা ভাবেননি। জানা ১০ হাজার প্রজাতির পাখির মধ্যে এই বিরল পাখিটি না থাকলে কী আসে যায় এমন কথাও তাঁদের মনে উদয় হয়নি। একটি পাখি তার সকল বৈশিষ্ট নিয়ে ছিল, এখন আর থাকবেনা, এই কথাটিই তাঁরা মানতে পারছিলেন না– নেহাৎ হৃদয়ের টানে। যদি কোনদিন আমাদের বসন্তে কোকিলের ডাক শুনতে না পাই– আমাদের মনের অবস্থাটি কী হবে? আমাদের সে পরিস্থিতি আসেনি– কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এসেছে। সেখানেও একদিন কোকিলের কুহু কুহু বসন্তের আগমণ বার্তা দিতো, ইংরেজ কবি তা নিয়ে কবিতাও লিখতেন। কিন্তু এখন একেবারে বিলুপ্ত না হলেও সেখানে এটি খুবই বিরল হয়ে পড়েছে, এবং সেজন্য মর্মবেদনাও অনেক।

জীববৈচিত্র সম্পর্কে, বিশেষ করে পরিচিত জীববৈচিত্র সম্পর্কে আমাদের আবেগ বেশ ঘন। কিন্তু আবেগ বর্জিত ভাবে শুধু অর্থনীতির কথাই চিন্তা করলে আমরা অবাক হয়ে যাব নিজেদের অজান্তে আমরা কী রকমের ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি।

অর্থনৈতিক ভাবে জীববৈচিত্রের মূল্য দেখতে গেলে আমাদেরকে দুটি দিককে পৃথকভাবে দেখতে হবে। একটি হলো যেই মূল্য হিসাবের মধ্যে আসে, আর একটি হলো যা আমরা কখনো হিসাব নিকাশের মধ্যে আনিনা। দুনিয়ার সব দেশের মিলিত জাতীয় আয়ের হিসাব নিলে তার মধ্যে একটি বড় অংশই দেখা যায় জীববৈচিত্র থেকে এসেছে। কিন্তু জাতীয় আয়ের হিসাবের বাইরে থেকে যায় আরো বড় সব অর্থনৈতিক অবদান। সেগুলোকেও দেখা দরকার। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৯৭ বছরটির জন্য এই শেষোক্তগুলোর হিসাব কষে দেখা গেছে লেখা-জোকার বাইরে সে বছর জীববৈচিত্র যেসব সেবা দুনিয়াকে দিয়েছে তার মূল্য দাঁড়ায় ৩৩ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৩৩ লক্ষ কোটি ডলার। আর ঠিক ঐ বছর দুনিয়ার সব দেশের সর্বমোট জাতীয় আয় ছিল ১৮ লক্ষ কোটি ডলার। অর্থাৎ দুনিয়ার জাতীয় আয়ের প্রায় দ্বিগুণের মত সেবা আমরা পেয়েছি জীববৈচিত্র থেকে যা হিসাবের সম্পূর্ণ বাইরে রয়ে গেছে, যে সব সেবা আমরা কখনো ভাবনার মধ্যেই আনিনা।

হিসাবের ভেতরেরগুলোই প্রথমে দেখা যাক, যেগুলো জাতীয় আয়ের অন্তর্ভূক্ত। কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা ইত্যাদি বিভিন্ন খাতগুলো থেকে আয়ের একটি বড় অংশই জীবের সঙ্গে জড়িত, এবং বিচিত্র রকম জীবের সঙ্গে। কৃষির প্রায় সবটুকু বিশেষ করে খাদ্যশস্যের পুরো মূল্যটাই আসে জীববৈচিত্র থেকে। শিল্প কাঁচামালের একটি বড় অংশও এভাবেই আসে– রাবার, উদ্ভিজ তেল, কাগজ, কাঠ, আঁশ, রং ইত্যাদি অসংখ্য শিল্পের। শুধু মাৎস্য সম্পদের কথা ধরলেও এর থেকে বছরে আয় হয় ৮,২০০ কোটি ডলার। এক সময় ওষুধের প্রায় পুরোটাই আসতো উদ্ভিদ বা প্রাণিজগত থেকে– এখনো দুনিয়ার বিশাল জনগোষ্ঠি ওষুধের জন্য এদের উপরেই নির্ভর করে– বিশেষ করে আফ্রিকায়। যদিও এখন বেশির ভাগ ওষুধ রাসায়নিক ভাবে উৎপন্ন হয়, তারপরও বছরে ৮,৪০০ কোটি ডলার মূল্যের আধুনিক ওষুধ সরাসরি জীবজগত থেকে আসছে। আধুনিক প্রেসক্রিপশন ওষুধের এক চতুর্থাংশ আসে উদ্ভিদ থেকে, ১৩% আসে অণুজীব থেকে (যেমন ফাঙ্গাস থেকে এন্টিবায়োটিক), আর ৩% আসে প্রাণি থেকে। মজার ব্যাপার হচ্ছে উদ্ভিদ বা ফাঙ্গাসের অতি সামান্য অংশই ওষুধ গুণের জন্য এ পর্যন্ত পরীক্ষিত হয়েছে। তাতেই আমরা এত ওষুধ পেয়েছি। এন্টিবায়োটিক অনুসন্ধানের জন্য যথাযথ ফাঙ্গাসের ২% মাত্র পরীক্ষার আওতায় আসেছে। যখন আরো অনেকগুলো আসবে তখন এক্ষেত্রে জীববৈচিত্রের অবদান যে অনেক বেড়ে যাবে তা নিসন্দেহ।

সাধারণ অর্থনীতিতে জীববৈচিত্রের অবদান সাম্প্রতিককালে আরো নূতন ভাবেও আসছে। ইকো-ট্যুরিজম অর্থাৎ পরিবেশ পর্যটন তার মধ্যে একটি। পৃথিবীর বেশ কিছু দেশ তাদের জীববৈচিত্রকে সংরক্ষণ করে তা দেখাতে দেশ-বিদেশের পর্যটকদেরকে আকর্ষণ করছে। এর সাফল্য প্রমাণ করেছে দুনিয়াতে প্রকৃতি, বন, জীবজন্তুকে তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্যে দেখার জন্য মানুষের প্রচণ্ড আগ্রহ রয়েছে। ঘন বন, নদী-হ্রদের জীব পরিবেশ থেকে শুরু করে পার্বত্য ভূমি এমনকি মরুভূমির বৈশিষ্টময় জীববৈচিত্রের প্রতি এই আকর্ষণ রয়েছে। প্রকৃতি প্রেমিক পর্যটকরা এসবের কোন ক্ষতি না করেই এদেরকে উপভোগ করতে পারেন, এবং এজন্য যথেষ্ট ব্যয়ও করেন। এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে এই খাতেই জীববৈচিত্র আয় নিয়ে আসছে বছরে প্রায় ৫০ হাজার কোটি ডলার।

যে সেবার কোন হিসাব নাই

জীবপারিবেশিক যে সব সেবা জীববৈচিত্র সব সময় আমাদেরকে দিচ্ছে তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা যদি আমাদেরকে অর্থব্যয় করে নিতে হতো তা হলে তার খরচ

দাঁড়াতো অসম্ভব রকম। এই সেবাগুলো কী ধরনের? যেমন পুষ্টি দ্রব্যের বার বার পুনরাবর্তনের কথা ধরা যাক। নাইট্রোজেন কার্বন, ফসফরাস ইত্যাদি মৌল বস্তু আমাদের শরীর গঠনে অত্যাবশ্যক। এগুলো কিন্তু অজৈব জগৎ থেকেই জীব জগতে আসছে আবার অজৈব জগতে ফেরতও যাচ্ছে। এভাবেই কার্বন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র ইত্যাদির আকারে আমরা বার বার এদের পাচ্ছি। কিন্তু এই চক্রগুলো সবই রয়েছে জীব জগতের কল্যাণেই। যেমন বাতাসের নাইট্রোজেনকে উদ্ভিদের জন্য মাটিতে আনে রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া। পরে জীবের মৃত্যু হলে মৃতদেহ থেকে এই নাইট্রোজেন আবার বাতাসে যায়।

তারপর মাটির উর্বরতা রক্ষার কথায় আসা যায়। মাটিকে ঝুর ঝুরে করা, উদ্ভিদের জন্য উপযুক্ত করা, জৈব যৌগগুলো ভেঙ্গে উদ্ভিদের জন্য পুষ্টিদ্রব্য তৈরি করা ইত্যাদি সব মাটির ভেতরের জীবের কাজ। কেঁচো, কেরা পোকা, অন্যান্য পোকা, ফাঙ্গাস, আলজি, ব্যাকটেরিয়া সবই নানা ভাবে এতে অবদান রাখে। মাটির অবক্ষয় রোধ করার জন্য ঘাস ও অন্যান্য উদ্ভিদের ভূমিকাও আমাদের বেশ জানা রয়েছে।

বাতাস ও পানির বিশুদ্ধতা রক্ষার কাজে জীববৈচিত্র এক অনন্য ভূমিকা পালন করে। বাতাসের যে গঠন প্রধানত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও স্বল্প অন্যান্য কিছু গ্যাসের সমন্বয়ে গড়া, তা প্রায় একই থেকে যাচ্ছে সব সময়। এটি সম্ভব হচ্ছে জীবের কারণে। জীবই বাতাসে অক্সিজেন পুনরাবর্তিত (রিসাইকেল) করে; নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদিকেও করে– শ্বাস, সালোক সংশ্লেষণ, নাইট্রোজেন সার তৈরি, ইত্যাদি প্রক্রিয়ায়। বহু কোটি বছর আগের সুদূর অতীতে পৃথিবীর বাতাসে অক্সিজেন ছিলনা। সেই আমলের ব্যাকটেরিয়ারূপী জীবরা অক্সিজেন ব্যবহারও করতোনা। কিন্তু ওদের মধ্যেই অক্সিজেন সৃষ্টিকারী নীল-সবুজ ব্যাকটেরিয়ার কাজের দ্বারা পরবর্তীকালের অক্সিজেন সমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডল এবং অক্সিজেন নির্ভর উন্নত জীব আসতে পেরেছিল। এভাবে নানা কালের জীববৈচিত্রই বায়ুমণ্ডল সহ পৃথিবীর অনেক কিছুকে গড়ে পিটে নিয়েছে।

ডাকউইড

বিশুদ্ধ পানির ক্ষেত্রেও এমনটি বলা যায়। আমরা বিশুদ্ধ পানির সরবরাহের জন্য হয়তো পানি বিশোধন কেন্দ্রগুলোর দিকেই তাকাই। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় মাপের বিশোধনের

ডাকউইডের দ্বারা শোধিত বর্জ্য পানি

কাজ করছে জীববৈচিত্র। নানা উদ্ভিদের পানি বিশোধনকারী অদ্ভূত গুণ রয়েছে। বনের মধ্য দিয়ে, নানা রকম শৈবাল, পানা, ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের মধ্য দিয়ে আসার সময় পানি বিশোধনের কাজ অনেকটা হয়ে যায়। যেমন ডাকউইড বা ক্ষুদে পানার এই বিশোধনের ব্যবহার এত প্রত্যক্ষ যে তার মাধ্যমে বিশেষ ব্যবস্থায় মানব-বর্জ্য সহ নানা রকম দূষণ থেকে পানিকে মুক্ত করার প্রচলন অনেক জায়গায় রয়েছে। বিশেষ করে খাড়ি অঞ্চলে কিছুটা আবদ্ধ পানিতে নগর-বর্জ্য, সার, সাবান ইত্যাদি সঞ্চিত হবার ফলে ক্ষুদ্র আলজির অতিরিক্ত সমৃদ্ধিতে সে পানি অক্সিজেনশূন্য বিষময় হয়ে পড়তে চায়। তখন সেখানকার শামুক, ঝিনুক, স্লাগ, স্কুইড ইত্যাদি ধরনের প্রাণি ঐ মৃত আলজির মৃতদেহের বর্জ্যগুলোকে শোষণ করে নিয়ে পানিকে আবার জীবনের উপযুক্ত করে তোলে।

একটি হিসাবে দেখা যায় যে উদ্ভিদ, জীবাণু, প্রাণি তাদের সম্মিলিত কাজের মাধ্যমে বছরে ১৩ হাজার কোটি মেট্রিক টন বর্জ্য দোষমুক্ত করে। এক সময় নিউয়র্ক নগরীর পানি সরবরাহের বড় অংশ আসতো কিছু পাহাড়ী এলাকায় গড়িয়ে আসা বৃষ্টির পানি থেকে– যা নিকটবর্তী বনশোভিত এলাকার মধ্য দিয়ে শোধিত হয়ে আসতো। পরে ঐ অঞ্চলগুলোতে বন বিনষ্টি ও মানব বসতির ফলে এই সুযোগ আর ছিলনা। তখন এর বিকল্পের জন্য পানি শোধনাগার তৈরি করতে লেগেছে প্রায় ৮শত কোটি ডলার। জীববৈচিত্র আমাদের জলবায়ুকে একটি স্থিতিশীল অবস্থা দিচ্ছে। পৃথিবীর বনাঞ্চলের সম্মিলিত উদ্ভিদ যে পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে রাখছে, সেই কার্বনকে নিজের দেহে ধারণ করছে, তা যদি বাতাসে যেত তা হলে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তন আরো অনেক ভয়াবহ হতো। গাছপালার কারণে ঝড় তুফানের তীব্রতা কমে, বন্যার পানি দ্রুত মাটির উপর দিয়ে দ্রুত গড়িয়ে যেরকম কঠিন বন্যা ঘটাতে

পারতো তা পারেনা। এভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং ঝড়ের প্রকোপ হ্রাসকে যদি কৃত্রিম উপায়ে করতে হতো তা হলে তার ব্যয় হতো অসম্ভব রকমের বেশি।

জীববৈচিত্রহীন জগৎ

চোখ বন্ধ করে আমরা যদি জীববৈচিত্রহীন একটি জগৎ কল্পনা করি, তা হলে রীতিমত শংকিত হতে হবে। এটি শুধু আমাদের প্রিয় পরিচিত জগতটি হারিয়ে যাবে বলে নয়, বরং সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে সব অত্যাবশ্যকীয়, অনেক ক্ষেত্রে জীবন রক্ষাকারী, সেবা থেকে বঞ্চিত হবো তার জন্যও। আমাদের শরীরে যে অনেক বন্ধু ব্যাকটেরিয়া রয়েছে, তাদের অভাবে শরীরের ও স্বাস্থ্যের অবনতির মাধ্যমেই সেই দুর্দশা শুরু হবে। আমাদের যে খাদ্য শৃঙ্খল তো পুরাপুরিই জীব জগতের উপর নির্ভরশীল। সূর্যের আলোর সাহায্যে অজৈব উপাদান থেকে খাদ্যের মূল উৎপাদকই হলো ক্ষুদ্র উদ্ভিদ-প্ল্যাংকটন থেকে শুরু করে ছোট বড় সকল উদ্ভিদ। তারা ছাড়া খাদ্য শৃঙ্খল শুরুই হতে পারবেনা।

কীট পতঙ্গ, পাখি, বাদুড় ইত্যাদি পরাগায়নের কাজ করে সকল সপুষ্পক উদ্ভিদকে ও আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে বজায় রেখেছে। তাদের অবর্তমানে এটিও সম্পূর্ণ ধসে পড়বে। আমাদের জীবন তখন কোথায় গিয়ে ঠেকবে?

তারপর বর্জ্যের কথায় যদি আসি– একটি দিনের জন্যও যদি জীব জগত বিশেষ করে জীবাণু জগত এই কাজে ধর্মঘট করে, তা হলে আমাদের জীবন যে দুর্বিসহ হয়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য। মাঠে-ঘাটে যেই জীব যেখানে মরছে সেখানেই পড়ে থাকবে। যেই বর্জ্য যেখানে যাচ্ছে সেখানে সে ভাবেই জমতে থাকবে।

বায়ো-ইঞ্জিনিয়ার
বীভার বাঁধ তৈরি করছে

জীবাণুর কাজের মাধ্যমে পচে সরে যাবেনা, অন্যান্য প্রাণিরা খেয়েও নেবেনা। যখনই যে কোনভাবে পরিবেশে বিপর্যয় আসছে– বর্জ্য জমে যাচ্ছে, পুকুর বা খাড়ি মজে যাচ্ছে, বনের বৃক্ষ বিনষ্টি ঘটছে– জীববৈচিত্রই এগিয়ে আসে সেটির প্রতিকারে। জীববৈচিত্র বিলুপ্ত হতে থাকলে এই প্রতিকার আর আসবেনা। ধীরে ধীরে আমাদের পরিচিত দুনিয়াটি একটি অবক্ষয়ের দিকে চলে যাবে।

বীভারের তৈরি বাঁধ

জীববৈচিত্র না থাকলে পৃথিবীর বুকেও অনেক আকাঙ্খিত পরিবর্তন থমকে দাঁড়াবে। অনেক পরিবর্তন জীবেরাই আমাদের আশেপাশে সব সময় ঘটাচ্ছে আমরা লক্ষ্য করিনা। ভূমিকে উলটপালট করে উর্বর করে বলে আমরা কেঁচোকে বলি প্রকৃতির লাঙ্গল। পরিবেশে আরো কুশলী উপকারী পরিবর্তন ঘটাচ্ছে কিছু প্রাণি যাদেরকে আমরা বলতে পারি প্রকৃতির ইঞ্জিনিয়ার, অথবা বায়োইঞ্জিনিয়ার। যেমন উদের মতো প্রাণি বীভারের কথাই ধরা যাক। এরা নদীতে, খালে বাঁধ দিয়ে স্রোত আটকায় এটিই তাদের স্বভাব। নানা রকম উদ্ভিদ ঝোপ ডালপাতা সংগ্রহ করে এনে এই বাঁধ তারা বানায়। এর ফলে প্রবহমান খালের বদলে ঐ জায়গাটিতে একটি বদ্ধ ডোবার সৃষ্টি হয় যেখানে ঐ গাছপালাগুলো পচেই আরো নানা রকম জীবের আবাস গড়ে তোলে। দেখা যায় বীভার এভাবে জীববৈচিত্র বাড়াবার আয়োজন করে পরিবেশকে বদলিয়ে। হাতি যখন উদ্ভিদ খেয়ে ও দলিত মথিত করে অনেক উদ্ভিদকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়, তখন আরো অন্য রকম উদ্ভিদ ও তার মধ্যে নানা প্রাণির বসবাসের সুবিধা হয়ে যায়। হাতিও তাই বায়োইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে গণ্য। আরো যেমন রয়েছে গোফার নামের একরকম কচ্ছপ। এরা মাটির ভেতর বড় সুড়ঙ্গ কাটতে পারদর্শী। এই সুড়ঙ্গ চলে যায় ভেতরে অনেক মিটার দূর। এই সুড়ঙ্গ শুধু ঐ কচ্ছপকেই আশ্রয় দেয়না, দেয় আরো বহু রকম জীবকে। এরকম অনেক বায়োইঞ্জিনিয়ারদের অনুপস্থিতিও দুনিয়াটাকে ভিন্নতর করে তুলবে, এদের অভাবে জীব আরো বৈচিত্র হারাবে।

মঙ্গল গ্রহের মত জায়গা স্পষ্টত জীব-বান্ধব নয়। সেখানে মানুষের বসতি স্থাপনের কথা যখন উঠে তখন কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন আগে সেখানে চরম পরিস্থিতি সহ্য করতে পারে এমন ব্যাকটেরিয়া বা অনুরূপ অণুজীব পাঠাতে হবে। ওরা ওখানকার প্রতিকূল পরিবেশকে মানুষের জন্য কিছুটা হলেও অনুকূল করে তুলবে– অন্তত স্থানীয় ভাবে। এর পরেই হয়তো মানুষের সেখানে যাওয়াটি যুক্তিসঙ্গত হবে। এটি অসম্ভব কিছু নয়, কারণ আমাদের পৃথিবীর আদিতেও যে পরিবেশ ছিল তা মানুষের মত প্রাণির বাসযোগ্য ছিলনা। অনেক ব্যাকটেরিয়া সেদিন বায়োইঞ্জিনিয়ারের কাজ করেছিল অতি ক্ষুদ্র হয়েও, পরে অন্যান্যরাও করেছে– যারা পরবর্তীদের জন্য পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলেছিল।

ভবিষ্যতের অজানা মূল্য

অনেকে খুব চাঁছাছোলা ব্যবসায়িক নিয়মে এক একটি প্রজাতির বর্তমান মূল্য নিরূপণ করতে চান। সেই হিসাবে এখানে এই পাখিটি, ওখানে ঐ সরীসৃপটি বিলুপ্ত হলে তাঁরা হিসাব কষে তেমন বড় ক্ষতি খুঁজে পাননা। তাছাড়া অতিশিকার ইত্যাদির ক্ষেত্রেও তাঁরা যুক্তি দেখান যে এখন ওদেরকে ধরে অর্থে রূপান্তরিত করাটাই অর্থনীতির দিক থেকে সঠিক কাজ, ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেয়া সুবিবেচনার কাজ নয়, কারণ তাঁদের হিসাবে ভবিষ্যতের পরিস্থিতিতে এর আর্থিক মূল্য হ্রাস পাবে। কিন্তু তাঁদের কট্টর ব্যবসায়িক হিসাবেও কথাটি ঠিক নয়। একটি জীবপ্রজাতির বর্তমানের মূল্যটি আমরা জানি। কিন্তু প্রকৃত ভবিষ্যৎ মূল্য আমরা এখন বলতে পারিনা।

গত শতাব্দীতে বেপরোয়া নীল তিমি মেরে এই বিশাল প্রাণিটিকে যখন প্রায় বিলুপ্ত করে ফেলা হয়েছিল তখন ঐ ধরনের ব্যবসায়িক যুক্তি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আমরা তো জানিনা, একশ' বছর কি পাঁচশ বছর পর নানা দিক থেকে এই তিমির মূল্য কী হবে? অথচ আজ যদি স্বল্প মেয়াদী ব্যবসায়িক বিবেচনায় আমরা এমন ব্যবস্থা করি যে একশ' বছর পর এই তিমি আর থাকবেইনা, তা হলে সেই অজানা সম্ভাবনা তো আমরা এখনই শেষ করে দিচ্ছি তাকে বিকাশের কোন সুযোগ না দিয়ে।

আমরা দেখেছি এখন পর্যন্ত পৃথিবীর যাবতীয় উদ্ভিদ, ফাঙ্গাস ইত্যাদির অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশকে আমরা তাদের ভেষজ গুণের জন্য পরীক্ষা করতে পেরেছি। শুধু এই দিকটি বিবেচনা করলেও এদের বিশাল বৈচিত্রের মধ্য লুকিয়ে রয়েছে অপার সম্ভাবনা– যা ভবিষ্যতে উন্নততর প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ঘাটিত হবে। আসলে জীববৈচিত্রের থেকে যত রকমের উপকার আমরা পাচ্ছি এ সবের গুণাগুণ নিহিত

আছে বিভিন্ন প্রজাতির ও তার নানা সদস্যদের ডিএনএর বৈচিত্রের মধ্যে– অর্থাৎ তার জেনেটিক তথ্য বা কৌলিক তথ্যের মধ্যে। বহু কোটি বছরের বিবর্তন এক একটি প্রজাতির মধ্যে এই কৌলিক বৈশিষ্ট সৃষ্টি করেছে– এসবের সম্মিলিত ফল জীববৈচিত্রের কৌলিক সম্পদ। এই সম্পদের খুব ক্ষুদ্র অংশই ইতোমধ্যে সরাসরি আমরা নিজেদের চেষ্টায় কাজে লাগাতে পেরেছি– যেমন ভেষজ গুণের একটি অংশ। জেনেটিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এক্ষেত্রে গতি আসছে– ইতোমধ্যেই আমরা বেশ কয়েকটি প্রজাতির পূর্ণ ডিএনএ উদ্ঘাটন করতে পেরেছি এবং নানা গুণাগুণের জিন তার মধ্যে চিহ্নিত করতে পারছি। ভবিষ্যতে এভাবে দ্রুততর হারে অনেক কৌলিক সম্পদ আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হবে। কিন্তু একটি প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেলে সেই সঙ্গে তার কোটি কোটি বছরের কৌলিক সম্পদও চিরতরে হারিয়ে যায়, ভবিষ্যতের সকল সম্ভাবনার অবসান ঘটে।

জিন কারিগরি এই বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছে। জিন প্রযুক্তির জন্য পুরো জীবজগৎ অনুসন্ধান করে দরকারী জিনটি তার যে কোন প্রজাতি থেকে খুঁজে নিয়ে তা প্রাসঙ্গিক অন্য প্রজাতির ডিএনএতে সন্নিবেশিত করা হয়। জীববৈচিত্র সঙ্কুচিত হয়ে গেলে ঐ দরকারী জিনটি খুঁজে পাওয়ার সুযোগও সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে। যেমন জিন কারিগরির মাধ্যমে ভিটামিন এ সমৃদ্ধ সোনালী চাউল উদ্ভাবনের জন্য ড্যাফোডিল ফুলের একটি জিনই উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছে। ড্যাফোডিল বিলুপ্ত হয়ে গেলে এই সুযোগ কি থাকতো? এভাবে নানা জীব-প্রজাতি থেকে উপযুক্ত জিন সংগ্রহ করেই ইতোমধ্যে আরো এসেছে রোগ বালাই, বন্যা-খরা সহ্যকারী শস্য, রোগের ওষুধ ইত্যাদি অনেক কিছু। কিন্তু এ নেহাত শুরু মাত্র। ভবিষ্যতে এটি দুনিয়াকে বদলে দেবার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু ততদিন ঐ জিনের বাহকরা থাকবে কি?

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্থাপত্য ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে আমরা অহরহ কোন না কোন জীবের কাছ থেকে শিখেছি– যাকে বলা হয়ে থাকে জীব-অনুকরণ (বায়োমিমিক্রি)। এই অনুকরণ যে করছি তা সব সময় সবার জানা না থাকলেও এর মূল উদ্ভাবকরা সে ভাবেই তাঁদের প্রথম আইডিয়াগুলো পেয়েছেন অথবা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। খুব সাধারণ নিত্য ব্যবহৃত একটি জিনিসের কথা বলি– ভেলক্রো। জুতা বা ব্যাগ ইত্যাদি বন্ধ করা থেকে শুরু করে নানা যন্ত্রপাতিতেও দুই অংশকে চট্ করে চেপে জোড়া লাগিয়ে আবার চট্ করে টেনে খোলার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। একদিকে ছোট্ট অনেক কাঁটার 'হুকে' গড়া আর অন্যদিকে কাপড়ের বুনোটের মত ছোট্ট অনেক 'লুপে' গড়া দুই অংশকে চেপে দিয়েই এই শক্ত বাঁধন সৃষ্টি করা যায়। এই বুদ্ধিটি এর উদ্ভাবক পেয়েছিলেন এক রকম চোর

কাঁটা থেকে। সকালে পোষা কুকুরটিকে নিয়ে ঘাসের মধ্য দিয়ে প্রাতভ্রমণে গিয়ে নিজের প্যান্টকে চোরকাঁটায় আবৃত হতে দেখে তিনি প্রত্যেক চোরকাঁটায় থাকা ক্ষুদ্র শক্ত হুক যে কী ভাবে কাপড়ের বুনোনির লুপে আটকে যায় তা লক্ষ্য করেছিলেন। এমনি জীব-অনুকরণের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। উচ্চতর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন বলা যায় সালোক সংশ্লেষণের সূক্ষ্ম রহস্য বিজ্ঞানীরা এখন নানা উদ্ভিদ থেকে শেখার চেষ্টা করছেন। এতে সফল হলে কৃত্রিম ভাবে খাদ্য তৈরিই শুধু নয় পানি থেকে পরিবেশ বান্ধব দক্ষ জ্বালানি হাইড্রোজেন সৃষ্টির মাধ্যমে শক্তি-উৎসের একটি বড় সুরাহা হয়ে যেতে পারে।

বিমান-প্রযুক্তির মত একটি দিকেও শুধু যদি তাকাই পদে পদে জীব অনুকরণের দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। ঐতিহাসিকভাবে বিমান বা হেলিকপ্টারের আকৃতির ধারণাটিই তো এসেছিল পাখি থেকে, সেই লিওনার্দো দা ভিঞ্চির প্রাথমিক স্কেচগুলো থেকে যার প্রমাণ আমরা পাই। একেবারে সাম্প্রতিক কালেও দেখছি সর্বাধুনিক অতিকায় বিমানের ডানার প্রয়োজনীয় দৈর্ঘকে বর্তমান বিমান বন্দরগুলোতে উঠা-নামা করতে পারার জন্য সীমার মধ্যে রাখতে গিয়ে ষ্টেপ ঈগলের মত পাখিকে অনুকরণ করতে হয়েছে। ঐ বিরাট পাখিটি প্রায়ই গ্লাইডারের মত বাতাসে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে উড়ে। যেখানে গরম বাতাসের স্তম্ভ দ্রুত উপরের দিকে উঠতে থাকে ঈগল তার উপর ডানা মেলে দেয়। ঐ বাতাস তাকে উপরে নিয়ে যায়– কষ্ট করে তাকে আরোহণ করতে হয়না। কিন্তু তার ভার বহন করার জন্য যত দীর্ঘ ডানা লাগার কথা তাতে ডানার একাংশ বায়ু স্তম্ভের বাইরে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকতো। কিন্তু ঈগল ডানার একেবারে প্রান্তের পালকগুলো খাড়া উপরের দিকে তুলে দিয়ে ডানার কম দৈর্ঘ নিয়েও নিজের ওজন বাতাসে ভাসিয়ে রাখতে পারে (বাড়তি লিফ্‌ট সৃষ্টি করতে পারে)। ঈগলের কাছ থেকে এটি শিখে আধুনিক অতিকায় বিমানের ডিজাইনাররাও ডানার প্রান্তে একটি ছোট্ট উত্তোলিত অংশ দিয়ে এর সমস্যার সমাধান করেছেন। বিমানেরই সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকের আরেকটি উদাহরণ নিতে গেলে বিমানের টয়লেটে বর্জ্যের দাগ দূর করার জন্য যাতে বেশি পানি ব্যবহার করতে না হয় সে জন্য উদ্ভাবকরা পদ্ম পাতা থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। পদ্ম পাতায় পানি লেগে থাকতে পারেনা সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে যায় সঙ্গের ময়লাকে নিয়ে। এটি কী ভাবে সম্ভব হচ্ছে তা উদ্ঘাটন করে বিমানে টয়লেটে সে প্রক্রিয়ায় একটি কোটিং দিয়ে দেয়া হয়েছে। উড়ন্ত বিমানে অতিরিক্ত পানির ভার বহন করতে না হওয়া যে জ্বালানি সাশ্রয় ও প্রকারান্তে পরিবেশ রক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য। জীববৈচিত্র যদি হারিয়ে যেতে থাকে তা হলে ভবিষ্যতের সমস্যা সমাধান আমাদের পক্ষে নূতন নূতন জীব অনুকরণ করার সুযোগ ক্রমেই কমে যাবে। ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়া

থেকে শুরু করে বিশাল প্রাণি পর্যন্ত নানা জীবের কাছ থেকে আমরা নিত্য নূতন এত কিছু শিখছি যে ভবিষ্যতে এর অভাব হলে আমাদের অগ্রগতিতেও ছেদ পড়তে পারে।

জীববৈচিত্র এ জন্য একটি বিরাট সম্পদ, শুধু বর্তমানের জন্য নয়, বরং আরো বেশি করে ভবিষ্যতের জন্য। বাংলাদেশসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশ এখনো তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি জীববৈচিত্রের অধিকারী– বিশেষ করে বাদল বন অঞ্চলে তাদের ভৌগলিক অবস্থানের কারণে। আজ হয়তো আমরা এ সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে পারছিনা, বা অন্যরাও এর মধ্যে সব সম্পদ চিহ্নিত করতে পারছেনা। কিন্তু বিশ্ববাসীকে ভবিষ্যতে আরো বেশি করে আমাদের এই ভৌগলিক সম্পদের দ্বারস্ত হতে হবে– বিশেষ করে ভবিষ্যতের জেনেটিক প্রযুক্তির অগ্রগতির জন্য। এই জীববৈচিত্র রক্ষা না করলে আমরা আমাদের এই সুপ্ত সম্পদকেই অঙ্কুরে বিনষ্ট করবো। একে ধরে রাখতে পারলে ভবিষ্যতে হয়তো এর জন্যই আমাদের দেশ বড় সম্পদশালী হিসেবে বিবেচিত হবে।

মানুষের জীবপ্রেম

একেবারে বস্তুগত লাভক্ষতির বাইরেও কতগুলো বিষয় রয়েছে যা মানুষের জীবনমানকে উন্নত করে থাকে। প্রকৃতি ও জীববৈচিত্রের মধ্যে নান্দনিক ও নৈতিক সন্তুষ্টি লাভ এমনি কিছু জিনিস, যাকে এক কথায় জীবপ্রেমও বলা হয়। এটি যে শুধু বিশেষ প্রকৃতি প্রেমিক গোষ্ঠির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা নয়– বরং সাধারণভাবে এটি মানুষের মজ্জাগত বলেই মনে হয়। এ কারণেই মানুষ প্রকৃতি-শোভিত জায়গায় ভ্রমণ করতে পছন্দ করে, আশে পাশে নানা রকম পশুপাখির সান্নিধ্য তাদেরকে মুগ্ধ করে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে সারা দুনিয়ার সকল খেলাধূলা, ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা ইত্যাদি যত লোক দেখতে যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি লোক যায় চিড়িয়াখানা ও এক্যুরিয়ামগুলো দেখতে। সাম্প্রতিক কালে খুব দ্রুত ইকো-ট্যুরিজমের বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভও এটি প্রমাণ করে। বড় জীবের ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তাটি বেশি দেখা গেলেও ছোট ছোট পোকা মাকড় ইত্যাদির প্রতিও অনেক মানুষের আকর্ষণ বোধ আছে, যদিও অনেকের মধ্যে আবার তাদের প্রতি এক ধরনের অনীহা এবং ভীতিও কাজ করে। ইকো-পর্যটকরা এখন ক্রমেই অনুভব করছেন যে বনের মধ্যে একটি গাছের সঙ্গেই অসংখ্য ছোট জীবের যে জগত গড়ে ওঠে তাও কম বিস্ময়কর ও আনন্দদায়ক নয়।

যদি প্রশ্ন করা হয় গড়পড়তা মানুষ কী রকম পরিবেশে থাকতে বেশি পছন্দ করে, তা হলে দুনিয়ার প্রায় সব জায়গা থেকে একই ধরণের উত্তর আসবে। মানুষ থাকতে পছন্দ করে ছায়া ঢাকা, পাখি ডাকা, নদী বা হ্রদের পারের প্রাকৃতিক আবাসকে। বাস্তব কারণে অধিকাংশ মানুষের সে ভাবে থাকা না হলেও তার মন কিন্তু তাই চায়। আরো ভেবে দেখলে দেখা যায় তারা গাছপালা পছন্দ করলেও ঠিক বনের ভেতরে থাকতে চায়না। বরং তাদের পছন্দ এমন জায়গা যেখানে বেশ কিছু ছায়াদার গাছ থাকবে– কিন্তু সামনের দৃষ্টিসীমা ব্যাহত হবেনা, সেখানে জলাশয়ে মাছ খেলা করবে, ভূমিতে ঘাস থাকবে, কিছু ঝোপঝাড়ও থাকবে। এসবে ফড়িং প্রজাপতি খেলা করলে এবং দূরে গরু হরিণ ইত্যাদিকে চরতে দেখলে এটি আরো পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই প্রকৃতি, এই জীব-বৈচিত্র মানুষের অন্তর-কামনার অংশ। এটি এতটাই প্রবল যে আমাদের স্বাস্থ্যের উপরও তা প্রভাব বিস্তার করে। যে রকম পরিবেশের কথা বলা হলো এর মধ্যে কাটাতে পারলে যে স্বাস্থ্যের উপর ইতিবাচক প্রভাব ঘটে তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে হাসপাতালে খামার, ক্ষেত, বনের দৃশ্যাবলী সৃষ্টি করা গেলে, রোগের অনেক কিছু উপসর্গ দ্রুততর উপশম হয়, অস্ত্রোপচারের পর রোগী তাড়াতাড়ি সেরে উঠে।

এই ব্যাপারগুলো দেশ কাল পাত্র কালচার নির্বিশেষে এতই অভিন্ন যে স্পষ্টত এটি মানুষের জেনেটিক গঠনের মধ্যেই রয়েছে। আর বিবর্তনের ফলে কীভাবে এই জীবপ্রেম আমাদের ডি এন এ'তে গেল সে সম্পর্কেও ভাবনা রয়েছে। এ সম্পর্কে একটি তত্ত্ব হলো সুদূর অতীতে আমাদের পূর্বসূরি প্রথম মানব-সদৃশরা যেখানে গড়ে উঠেছিল সেখানকার পরিবেশ দ্বারা এটি নির্ধারিত হয়েছে। আফ্রিকার সাভানা তৃণভূমির ঐ পরিবেশে স্বচ্ছন্দ বোধ করার জিন মানুষের ডিএনএ বিবর্তনে টিকে গিয়েছে– আজও সেটিই আমরা বহন করছি। সেখানে ছিল অনুচ্চ তৃণভূমি ও ঝোপঝাড়, মাঝে মাঝে বড় বড় গাছের গুচ্ছ, কাছে হয়তো কিছু জলা যা ছিল তাদের পানির উৎস। আদি মানুষের সখ্য ছিল ওখানকার জীবজন্তুর সঙ্গে। ঐ সাভানার জেনেটিক স্মৃতিই বংশানুক্রমে এসে আজও আমাদেরকে এমনিতরো পরিবেশের প্রতি আকৃষ্ট করে।

আমরা অন্য প্রাণি ও উদ্ভিদের সঙ্গে যে এক রকম ঐক্য অনুভব করি, এবং প্রায়শ তা যে আমাদের আবেগের উপর কাজ করে এটি নিঃসন্দেহ। কাজেই নিজের ভাল থাকার স্বার্থেও জীববৈচিত্র আমাদের জন্য অপরিহার্য। একে বাদ দিয়ে যদি আমাদেরকে কখনো ভিন গ্রহের কৃত্রিম পরিবেশে চলে যেতে হয়, সেটি আমাদের অন্তরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়েই হবে। এই ঐক্যের কারণেই আমরা অন্য জীবের

সঙ্গটি উপভোগ করি, নিজেদের চিন্তা চেতনাকে তাদের উপর আরোপ করি। তাই হাজারো পাখির মধ্যে বিশেষ একটি মাছরাঙ্গাকেও যদি আমরা হারিয়ে ফেলি তখন বেদনা অনুভব করি। তাছাড়া এরই ধারাবাহিকতায় আমরা নিজেদেরকে জীবজগতের এক ধরনের অভিভাবকও মনে করি। আমাদের পুরো ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে জীবজগতকে রক্ষার একটি নৈতিক দায়িত্বও আমরা অনুভব করি। যদি এর বর্তমান অবক্ষয় প্রক্রিয়ার জন্য আমরা দায়ী নাও হতাম, এই নৈতিক দায়িত্ব আমরা তখনো অনুভব করতাম। আর নিজেরা জীববৈচিত্র বিলুপ্তির জন্য দায়ী হবার ফলে এই নৈতিক দায়িত্ব আমাদের অনেক গুণে বেড়ে গেছে। অর্থনৈতিক ও পারিবেশিক সব মূল্যের কথা বাদ দিলেও জীববৈচিত্রের এই নান্দনিক ও নৈতিক মূল্যটিও কম কথা নয়।

পড়শি বসত করে

জীববৈচিত্র মানে প্রজাতিবৈচিত্র

গত চারশ কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে জীববৈচিত্র সৃষ্টি হয়েছে। প্রাণের উন্মেষ কালে দেখা দিয়েছিল যে অতি সরল এককোষী ব্যাকটেরিয়া তা বিবর্তনের ফলে এখন রূপ পেয়েছে লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতিতে– ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রকাণ্ড নীল তিমি পর্যন্ত। এই প্রক্রিয়ায় নূতন নূতন প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছে, আবার প্রজাতি বিলুপ্তও হয়েছে। একই প্রজাতির কোন ভিন্ন দল যখন মূল দল থেকে তার 'ভূবনের' দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন সেটি নূতন প্রজাতিতে পরিণত হয়। মূল দল থেকে এই 'ভূবন' বিচ্ছিন্নতা বলতে ভৌগলিক অবস্থানের ভিন্নতা যেমন বুঝায় তেমনি আচরণগত নানা রকম ভিন্নতাও বুঝায়– বিশেষ করে প্রজননগত আচরণের। এভাবেই বসতের দিক থেকে, আচরণের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, নূতন নূতন ভূবনের অধিকারী হয়ে নূতন নূতন প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছে।

একই বসত, একই অভ্যাস, একই সুবিধা-অসুবিধার একটি ভূবন ভেঙ্গে যখন নানা কারণে অনেকগুলো ভূবনে পরিণত হয় তখন সেখানে কাছাকাছি ধরনের বহু নূতন প্রজাতির বিচ্ছূরণ ঘটে। আমরা যখন জীববৈচিত্রের কথা বলি তখন প্রধানত এই প্রজাতি বৈচিত্রের কথাই বুঝিয়ে থাকি। এক একটি প্রজাতির মধ্যেও অবশ্য নানা গোষ্ঠি বা জাতের বৈচিত্র থাকে, এমনকি এমন বৈশিষ্টময় পার্থক্যও থাকে যে কারণে সেই বিভাজনগুলোকে এক একটি উপ-প্রজাতিও বলা হয়। যেমন বাঘ একটি প্রজাতি হলেও - তার মধ্যে সাইবেরিয়ান টাইগার, সুমাত্রান টাইগার, বেঙ্গল টাইগার ইত্যাদি উপপ্রজাতি রয়েছে।

একটি প্রজাতি সারা দুনিয়ার নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকতে পারে। কিন্তু স্থানীয়ভাবে তাকে থাকতে হয় এক একটি জীব-পারিবেশিক ব্যবস্থায়, এক একটি ইকোসিস্টেমে। জীবন ধারণের জন্য অনেকগুলো প্রজাতি এক একটি জায়গায় মিলিতভাবে যেই পরিবেশের নানা সম্পদ ও সুবিধাগুলো ভোগ করে, সেটিই তাদের ইকোসিস্টেম। একটি পুকুর, একটি বিল, সাগরের একটি অঞ্চল যেমন একটি খাড়ি অথবা প্রবাল প্রাচীর, একটি বন, একটি মরুভূমি কি মরুদ্যান, একটি তৃণভূমি, একটি বাগান– এরকম অনেক কিছুই একটি

ইকোসিস্টেম হতে পারে। এমনি একটি ইকোসিস্টেমের মধ্যেই থাকতে পারে নানান ভূবন– যার প্রত্যেকটি এক একটি প্রজাতির। যেমন একটি বৃক্ষবাগানে বা বনে থাকে উচ্চ বৃক্ষ, ছোট বৃক্ষ, ঝোপঝাড়– সব ক্ষেত্রে বহু আলাদা আলাদা ভূবন। উচ্চ বৃক্ষের মগডালে শামিয়ানার পাখিদের ভূবন– তাদের আচরণের উপর নির্ভর করে ওখানেই থাকতে পারে অনেকগুলো ভূবন– এক একটি এক রকম পাখির। তেমনি ওখানেই আবার থাকতে পারে অন্যান্য প্রাণির ভিন্ন ভূবন– যেমন বানরের। কাছে থাকতে পারে অন্য প্রাণির অন্য রকম সব ভূবন, যেমন বৃক্ষের কিছু নিচের যে শাখা প্রশাখায় তার কোঠরে কাঠ বিড়ালিরা, তার বাকলের গায়ে গায়ে অসংখ্য কীট পতঙ্গের ভূবন। অন্যত্র ঝোপে ঝাড়েও অনেক পোকা মাকড়ের ভূবন। নিচে ঝরা পাতার মধ্যে মাটির ভেতরেও রয়েছে অনেক ছোট ছোট প্রাণির ভূবন। এই সব মিলিয়েই সেই বাগানের বা বনের ইকোসিস্টেম। এত রকমের এতগুলো জীবপ্রজাতি ঐ ইকোসিস্টেমের সম্পদ ও সুবিধাগুলোর মাধ্যমে জীবন যাপন করছে।

জীবের বসত বিন্যাস

ইকোসিস্টেমে কোন জীব একা থাকেনা, থাকতে পারেনা। তবে এর মধ্যে সব জীবের জন্যই একটি বসত এলাকা থাকে– যা তার অস্তিত্বের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এই এলাকার আয়তনটুকু সব প্রজাতির জন্য এক রকম নয়– কোনটির হয়তো মাত্র কয়েক কিউবিক সেন্টিমিটার– যদি সেটি একটি ক্ষুদ্র জীব

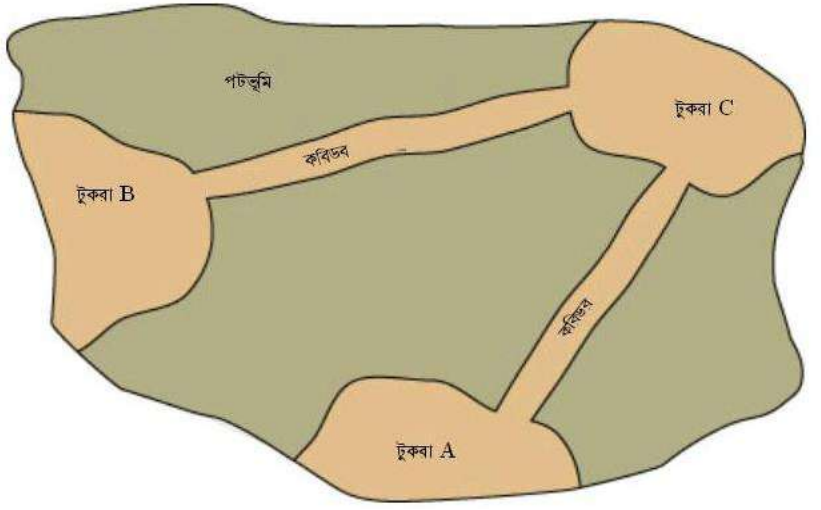

বসত বিন্যাসের উপাদানগুলো

হয়। আবার কোনটির হয়তো হাজার বর্গ কিলোমিটার– যদি সেটি আফ্রিকার সেরেঙ্গেটির মৌসুমী অভিবাসী পশু হয়। আর সেটি যদি নীল তিমি হয় তা হলে হয়তো কয়েকটি মহাসাগর একসঙ্গে তার বসতের অন্তর্গত। কিন্তু যার জন্য যতটুকু বসত প্রয়োজন সেটি না পেলে সেই প্রজাতির বসবাস কঠিন হয়। বসতের সঙ্কোচন যদি খুব গুরুতর হয় তা হলে সেটিই তাকে বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দিতে পারে।

মানুষ যে ক'টি প্রক্রিয়ায় জীববৈচিত্রের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে তার মধ্যে প্রধান হলো জীবের বসত বিনষ্টি। মানুষের কর্মকাণ্ডের কারণে এবং অন্যান্য নানা কারণেও ইকোসিস্টেমের মধ্যে নানা প্রজাতির বসত এলাকা ছোট হয়ে যাচ্ছে। যেই বসত আগে একটি নিরবিচ্ছিন্ন বড় এলাকা ছিল, এসব কারণে সেটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরা হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত কোন জীবের বসত বিন্যাসে দেখি সেখানে কতগুলো বিচ্ছিন্ন টুকরা রয়েছে একটি বিস্তৃত ভিন্ন পটভূমির মধ্যে। যেমন একটি বৃক্ষশোভিত বন অঞ্চলকে যখন আমরা নগরায়নের মধ্যে নিয়ে আসি তখন একটানা নগরের দালানকোঠা-রাস্তা ইত্যাদিই বিস্তীর্ণ পটভূমিতে পরিণত হয়। পশুপাখিদের নিরবিচ্ছিন্ন ঐ বনের বসত তখন টুকরা টুকরা হয়ে এখানে ওখানে কয়েকটি বাগান, পার্ক ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। অবশ্য এর মধ্যে একটি আশার কথা হলো ঐ টুকরাগুলো একেবারে বিচ্ছিন্ন না হয়ে তারা পরস্পর এক বা একাধিক করিডর দিয়ে যুক্ত থাকতে পারে। যেমন টুকরাগুলো একটির সঙ্গে আরেকটি যোগ করে গাছপালার অপেক্ষাকৃত সরু ও দীর্ঘ সারি এরকম করিডর হতে পারে। সাধারণ রাস্তার দু ধারে লাগানো গাছের সারি, বা খালের পারের ঝোপঝাড় ইত্যাদি, বা এমনি আরো কিছু এরকম করিডরের কাজ করতে পারে। সেক্ষেত্রে বসত বিন্যাসটি হবে একটানা নগরের পটভূমিতে ছোট ছোট বন-সদৃশ টুকরা যেগুলো সরু সরু লম্বা বৃক্ষ-ঝোপের করিডর দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত। এই ইকোসিস্টেমের জীবগুলো এখন মূলত ঐ টুকরাগুলোতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তবে প্রয়োজনে কিছুটা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে হলেও এরা ঐ করিডরের মাধ্যমে এক টুকরা থেকে অন্য টুকরায় যাতায়াত করতে পারে। রাস্তা বা খালের ধারের গাছপালা ছাড়া আরো কিছু জিনিস করিডরের কাজ করতে পারে– যেমন পাওয়ার লাইনের জন্য তৈরি খালি জায়গা যেখানে ঝোপঝাড় গড়ে উঠে, বাঁধের উপর গড়ে উঠা সরু বন ইত্যাদি। এটি অবশ্য নির্ভর করে পটভূমিটি কী তার উপরও। যেমন পটভূমি যদি নগর না হয়ে কৃষিভূমি হয়– অর্থাৎ জীবের বনভূমির বসত যদি কৃষি আবাদের দ্বারা টুকরা টুকরা হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে কৃষি জমির মাঝখানের ঝোপসমৃদ্ধ আইলগুলোই করিডর হতে

পারে। তেমনি অন্যান্য ক্ষেত্রে টুকরা ও করিডরের পটভূমি হতে পারে তৃণভূমি, কিংবা জলা, কিংবা ব্যবসায়িক একই গাছের বাগান ইত্যাদি।

বনের টুকরা, বৃক্ষসারির করিডর, কৃষিভূমির পটভূমি

টুকরা ছোট হয়ে যাওয়ার ফল

টুকরা টুকরা হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে বসত সংকুচিত হলে জীববৈচিত্র হ্রাস পায়। বসতের টুকরাগুলো যত ছোট হবে ওতে জীবগুলোর জন্য তত বেশি সংকট দেখা দেয়। ছোট টুকরার মধ্যে কম সংখ্যক প্রজাতি থাকবে এটি নানা কারণে স্বাভাবিক। যেমন আগের বড় একটি জায়গার একাংশই যদি টিকে থাকে তা হলে সেই অংশে যে ক'টি প্রজাতির আবাস শুধু সেগুলোইতো সেখানে পাওয়া যাবে– বাকিগুলো সংকটে পড়বে। তাছাড়া টুকরা ছোট হয়ে যাওয়ার ফলে ওর মধ্যেকার প্রজাতিগুলোর সদস্য সংখ্যা কমে যাবে। কোন কোনটি এতটাই কমে যাবে যে

সব জীবেরই থাকে নিজের হোমরেঞ্জ

এক জায়গায় ন্যূনতম যত সংখ্যক সদস্য থাকলে একটি প্রজাতির সেখানে টিকে থাকার মত পরিস্থিতি থাকে তাও সেখানে না থাকতে পারে। ফলে এভাবেও কিছু জীববৈচিত্র ওখানে কমে যাবে।

ছোট টুকরায় জীবের সমস্যাগুলো বুঝার জন্য একটি টুকরার 'অভ্যন্তর' ও 'কিনারার' পার্থক্যটি বুঝা দরকার। টুকরার সীমার বাইরে থাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম পরিবেশ– পটভূমি পরিবেশ। যেমন নগরের মধ্যে গাছপালার বাগানের সীমার বাইরেই থাকে নগরীর ইটপাথর– যেখানে ওখানকার প্রাণিগুলো বেরিয়ে আসা কঠিন। এমনকি টুকরার যে সব জীব ঐ সীমারেখার কাছাকাছি 'কিনারা অঞ্চলে' থাকে সেগুলোও বেশ কিছু ভিন্ন ধরনের হয়। এখানে ঝুঁকি বেশি– বাইরে থেকে আক্রমণ আসতে পারে সহজে, বাইরে গিয়ে বিপদে পড়তে পারে। অবশ্য কোন কোন প্রজাতির জন্য এখানে সুযোগও বেশি– কারণ বাইরে থেকে খাবার ইত্যাদি সম্পদ আহরণ তারা করতে পারে যেমন নগরের পটভূমিতে কাকের ক্ষেত্রে।

মোটের উপর বরাবরের মত নিরবিচ্ছিন্ন পরিস্থিতিতে শান্তিতে থাকার জন্য কিনারা থেকে দূরে টুকরার ভেতরের দিকে অর্থাৎ 'অভ্যন্তরে' থাকাটাই অধিকাংশ প্রজাতির জন্য সুবিধাজনক। টুকরার আয়তন যত ছোট হবে তাতে অভ্যন্তরের তুলনায় কিনারা বড় হয় এবং কিনারার প্রাধান্য বাড়ে। যে সব প্রজাতি নিরিবিলি অভ্যন্তরে বসত করে তাদের জন্য এটি দুঃসংবাদ, যেমন কোকিল এমনি একটি অভ্যন্তরের প্রাণি। এক সময় ইংল্যাণ্ডেও কোকিলের গানেই বসন্তের আগমণ সূচিত হতো। গ্রামাঞ্চলে কোকিলের বসত করার মত টুকরা ক্রমে ছোট হয়ে যাওয়াতে অভ্যন্তরের এই পাখির বাসস্থান, খাদ্য ও অন্য রসদের সরবরাহ কমে গেছে। ফলে এখন সেখানে কোকিল প্রায় বিলুপ্তির পথে। অন্যদিকে ঐ একই দেশে এখন বন্য হরিণের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। এর একটি কারণ হলো বসত টুকরা টুকরা হয়ে গেলেও সেগুলো অনেক করিডরের দ্বারা সংযুক্ত হওয়াতে এই কিনারার প্রজাতিটির তেমন কোন অসুবিধা হয়নি। বরং ছোট টুকরায় কিনারা প্রাধান্য পাওয়াতে এর সুবিধাই হয়েছে। তবে একই কারণে বন্য হরিণ প্রায়শ টুকরা বা করিডরের থেকে বের হয়ে আসার ফলে মহাসড়কগুলোতে গাড়ি চাপা পরে বেশি মারা যাচ্ছে। এসব সংঘর্ষের ফলে দুর্ঘটনায় মানুষ মারা যাওয়ার সংখ্যাও আগের থেকে বেড়ে গেছে।

আসলে ছোট ছোট টুকরা ও তাদের সংযোগকারী করিডরগুলো সংখ্যায় বেড়ে ক্রমে একটি জালের আকৃতি নেয়। এক একটি প্রজাতি কত সহজে এর মধ্য দিয়ে চলাচল করে জীবন যাপন করতে পারে তা নির্ভর করে এই জালের

প্রকৃতির উপর। টুকরা অতিরিক্ত ছোট হলে এই জাল খুব বেশি জটিল হয়ে জীবন যাপন দুরূহ হয়ে পড়ে। ফলে কোন বড় বসত টুকরা টুকরা হয়ে গেলে জীববৈচিত্রে দারুণ অবনতি ঘটে।

জীবের যাতায়াতের গণ্ডি

নিজের বসত এলাকার মধ্যে প্রত্যেক জীবের নিয়মিত যাতায়াতের একটি গণ্ডি থাকে যাকে হোম রেঞ্জ বলা হয়। সাধারণত খাদ্য ও পানি সংগ্রহে, যৌন সঙ্গী খুঁজে নিতে, কোন কোন ক্ষেত্রে আবহাওয়া-মৌসুম ইত্যাদির সঙ্গে তাল মিলাতে এক এক প্রাণির এক এক রকম ন্যূনতম যাতায়াতের জায়গার দরকার হয়। একটি পিঁপড়া বা পোকার ক্ষেত্রেও যেমন এরকম একটি ন্যূনতম গণ্ডি রয়েছে, তেমনি একটি ইঁদুরের রয়েছে, আবার বড় এলাকায় ঘুরে বেড়ানো চিতা বাঘেরও তা আছে। তাদের যাতায়াতের গণ্ডি যে যথেষ্ট ভিন্ন হবে তা বলাই বাহুল্য।

স্বাভাবিকভাবেই চিতার হোমরেঞ্জ বড়

বাড়িতে যে টিকটিকিগুলো দেখি তার কোনটিকে চিহ্নিত করে রাখলে এবং ক'দিন ধরে তার যাতায়াত নিত্য লক্ষ্য করলে তাদের যাতায়াতের গণ্ডি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। প্রাণির গলায় অবস্থান নির্ণায়ক জিপিএস যন্ত্র ও রেডিও ট্রান্সমিটার লাগিয়ে এবং তাদের চলাফেরার উপর দূর থেকে নজরদারি করে অন্য অনেক প্রাণিরও স্বাভাবিক যাতায়াতের গণ্ডি নির্ণয় করা হয়েছে। কোন প্রাণির যাতায়াতের গণ্ডি যদি সঙ্কুচিত করে ফেলা হয় তা হলে তার পক্ষে টিকে থাকতে বেশ অসুবিধা হয়। জীবকে খাদ্য পানি ইত্যাদি যার যেমন দরকার সেভাবে যাতায়াতের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হয়। সেটি করতে না পারলে বিপত্তি ঘটে। যেমন বাংলাদেশে নানা প্রাণির মধ্যে এটি ঘটছে– বসত বিনষ্টির ফলে। এটি চাঞ্চল্যকর ভাবে চোখে পড়ে হাতি বা বাঘের ক্ষেত্রে। দক্ষিণ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার

অঞ্চলে প্রায়শ গ্রামের মধ্যে হাতি বা হাতির পাল নেমে আসছে বনের দিক থেকে। এর ফলে গাছপালা, ফসল, ঘরবাড়ি ইত্যাদির প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। বনে হাতি তাড়াবার জন্য গ্রামবাসীকে নানা আয়োজন করতে হচ্ছে। হাতির পায়ের তলায় আহত হয়ে মানুষ মারাও যাচ্ছে। নিজেদের সংকুচিত এলাকায় খাদ্য সংকুলান হচ্ছেনা বলেই এ ভাবে হাতিকে লোকালয়ে আসতে হচ্ছে। সুন্দরবনে বাঘের আবাস ক্ষতিগ্রস্থ হওয়াতে বাঘকেও লোকালয়ে চলে আসতে কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে, সেখানে ভীত গ্রামবাসীদের হাতে বাঘ মারাও যাচ্ছে। এগুলো যাতায়াতের গণ্ডি ব্যাহত হবারই লক্ষণ।

যাতায়াতের গণ্ডি কমে গেলে শুধু যে খাদ্যের অসুবিধাতে জীব প্রজাতি দুর্বল হয়ে পড়ে তা নয়, তার জেনেটিক দুর্বলতাও ঘটে। ঐ গণ্ডির বিস্তৃতি থাকলে একটি জীব নিজের বংশগত নিকটাত্মীয়দের বাইরের অন্যদের সঙ্গে প্রজননগত সম্পর্ক ঘটাতে পারে, এবং ফলে প্রজাতির জেনেটিক বৈচিত্রের সমৃদ্ধি বজায় থাকতে পারে। এটি ব্যাহত হলে ক্রমে ক্রমে প্রজাতিটি অন্তপ্রজননের দিকে ঝুকে পড়ে এবং জেনেটিক বৈচিত্রের অভাবে তার টিকে থাকার ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। এ কারণে ক্রমাগত টুকরা হতে থাকা বসত সত্ত্বেও যাতায়াতের সুযোগ অব্যাহত রাখার জন্য টুকরাগুলোর মধ্যে ভাল করিডর থাকাটি জরুরী। তাই আজকাল এরকম বেশি ও সমৃদ্ধ করিডর স্থাপনের মাধ্যমে নানা জীব প্রজাতি রক্ষার চেষ্টা চলছে। স্থানীয় আকারে এগুলো তো করা হচ্ছেই, দেশে দেশে এমনকি আন্ত-মহাদেশীয় মেগাকরিডর স্থাপনের প্রচেষ্টাও আমরা পরে দেখবো।

ইকোসিষ্টেমে জীবসমাজ

একই ইকোসিষ্টেমের মধ্যে থাকছে শত শত জীবের একত্র বসত। এটি জীবের মৌলিক গুণাগুণগুলোর মধ্যেই একটি। জীব একা থাকতে পারেনা। প্রত্যেক প্রজাতি নিজেদের দলে তো থাকেই, সেই সঙ্গে আরো বহু প্রজাতির সঙ্গে সেটি খুবই ঘনিষ্ঠ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কের মধ্যে বাস করে। জীববৈচিত্রকে বুঝতে গেলে এভাবে একই জীবসমাজের

একটি ইকোসিষ্টেম: শীত প্রধান পাহাড়ী নদী ও বন

মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলোকে বুঝতে হয়। যেই স্থানে এরকম সমাজ গড়ে নানা প্রজাতির দলগুলো পরস্পরের সঙ্গে এবং স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে বিক্রিয়া করে– সেখানেই সৃষ্টি হয় একটি ইকোসিস্টেম।

ইকোসিস্টেমে যে জীবসমাজ তাতে বিভিন্ন প্রজাতির ভূমিকা কিছুটা আলাদা হতে পারে। সব মিলিয়ে ওখানে সবগুলো প্রজাতি ঐ জীবসমাজকে একটি স্থিতিশীল ভারসাম্য দিয়ে থাকে। অবশ্য ঐ একই ইকোসিস্টেমে প্রত্যেক প্রজাতির জন্য নিজস্ব 'ভূবন' থাকে। নিয়ম হচ্ছে কোন দুটি প্রজাতির কখনো একই ভূবন হতে পারেনা। ইকোসিস্টেমে এত প্রজাতির জন্য এতগুলো ভূবন কেমন করে সৃষ্টি হয়? এটি বেশ কয়েক ভাবে হতে পারে– যেমন এক এক প্রজাতির জন্য নানা ভৌত পরিস্থিতির সহ্য-ক্ষমতা এক রকম হতে পারে। জলজ জীবের কেউ হয়তো উন্মুক্ত পানির বেশি গভীরতা, কিংবা বেশি লবণাক্ততা সহ্য করে, আবার কেউ হয়তো তা করেনা। ইকোসিস্টেমের সম্পদ ব্যবহারে এক এক প্রজাতির এক এক ভঙ্গি হতে পারে– যেমন খাদ্যের বিভিন্নতা। একই পরিবেশে সাড়া দেবার ভিন্নতার ফলেও ভূবন বৈচিত্র ঘটতে পারে।

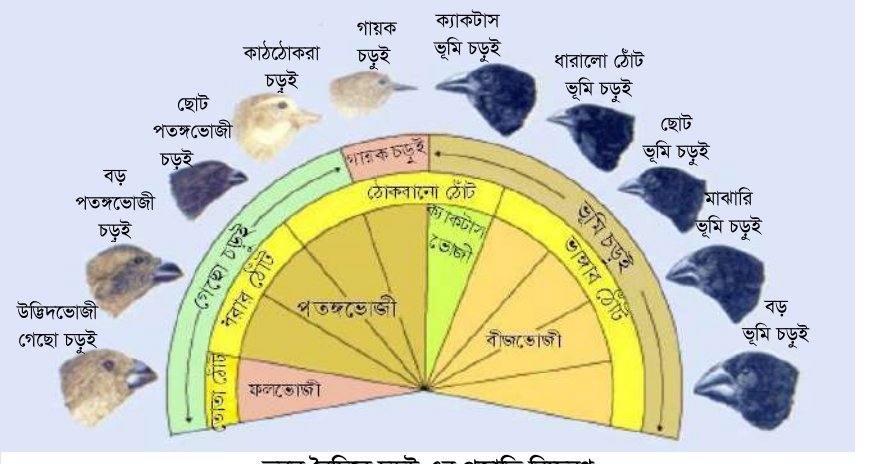

ভূবন বৈচিত্রে চড়ুই এর প্রজাতি বিচ্ছুরণ

কোন প্রজাতির ভূবনটি বেশ বিস্তৃত হতে পারে– যেমন বহু রকম পরিস্থিতিতেই সে ভাল থাকতে পারে। এর চরম উদাহরণ হলো মানুষের ক্ষেত্রে– প্রায় পুরো দুনিয়াটাকেই ও তার অসংখ্য রকম পরিস্থিতিকেই মানুষ নিজের ভূবন বানিয়ে নিতে পেরেছে। আবার কোন কোন প্রজাতির ভূবন অতি মাত্রায় সীমিত হতে পারে। যেমন লালঝুঁটি কাঠ ঠোকরা অন্তত ৭৫ বছরের পুরানো বড় গাছ না হলে তাতে বাসা করেনা। জায়ান্ট পাণ্ডা বাঁশ পাতা ছাড়া অন্য কিছু খায়না। তাই

স্বাভাবিক ভাবেই তাদের ভূবন খুবই সীমাবদ্ধ, এবং তাদের টেকার সম্ভাবনাও তাই কমে গেছে।

ইকোসিষ্টেমে জীবসমাজের প্রত্যেকটি প্রজাতির কমবেশি ভূমিকা থাকলেও কোন কোনটির বেশ বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে। যেমন এর মধ্যে কোন কোন প্রজাতি প্রাথমিক উৎপাদকের কাজ করে পুরো সমাজের জন্য। একমাত্র এরাই অজৈব পদার্থ থেকে সূর্যালোকের সাহায্যে সরাসরি খাদ্য উৎপাদন করে। তাই তাদের দিয়েই খাদ্য-শৃঙ্খলের শুরু। এরা যা উৎপাদন করে তার উপরই শেষ অবধি সবাই নির্ভর করে– কেউ প্রত্যক্ষভাবে তাদের উপর, অন্যরা বিভিন্ন মধ্যবর্তীদের মাধ্যমে। পুকুর, সাগর, বা অন্য যে কোন উর্বর জলাশয়ের জন্য এটি প্রধানত ক্ষুদ্র উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন। বনভূমিতে বা স্থল ভাগের সর্বত্র এটি যে কোন সালোক সংশ্লেষণকারী উদ্ভিদ– যা উদ্ভিদভোজিরা খেয়ে থাকে।

উপকূলে নোনা বন ইকোসিষ্টেম

প্রাথমিক উৎপাদকরা যদি ইকোসিষ্টেমে জীবসমাজের একেবারে ভিত্তিমূলে থাকে, তা হলে এর একেবারে শীর্ষে থাকে অন্য একটি বিশেষ ভূমিকার জীব– যাদেরকে শীর্ষ প্রজাতি বলা যায়। যেমন সুন্দরবনে বাঘ শীর্ষ প্রজাতি। তাকে আর কেউ খেতে পারেনা বলে সে খাদ্য ব্যবস্থার একেবারে শীর্ষ বিন্দুতে। এরকম আর কিছু বিশিষ্ট প্রজাতি হলো কী-ষ্টোন প্রজাতি। এই নামের কারণ হলো বক্রাকারে একের উপর এক পাথর সাজিয়ে তৈরি আর্চ বা খিলানে উচ্চতম যে পাথরটি সরিয়ে ফেললে পুরো খিলানটি ধসে পড়ে সেই পাথরটিকে কী-স্টোন বলা হয়। এটি একটি ছোট পাথর খণ্ড মাত্র হলেও পুরো খিলানের টিকে থাকা এর উপর

নির্ভর করে। তেমনি অল্প সংখ্যায় থাকা কী-স্টোন প্রজাতি বিলুপ্ত হলে ওখানে অধিক সংখ্যা সত্ত্বেও অন্য সব প্রজাতি দুর্যোগে পড়ে। সুন্দরবনের ইকোসিস্টেমে বাঘের ভূমিকা এই কী-স্টোন প্রজাতি রূপেও বটে। কারণ মাত্র গুটি কতেক বাঘকে ওখান থেকে সরিয়ে ফেল্‌লে শীর্ষ খাদকের অনুপস্থিতি অন্যান্য নানা প্রাণির সদস্য সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে শেষ অবধি তাদের অনেকগুলোর ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। কী-ষ্টোন প্রজাতি হতে গেলে যে সব ক্ষেত্রে শীর্ষ প্রজাতি হতে হবে তা কিন্তু নয়। অনেক অপেক্ষাকৃত ছোট জীবও কী-ষ্টোনের ভূমিকা পালন করে থাকে।

খিলানের কী-ষ্টোন

কিছু প্রজাতির আর একটি বিশেষ ভূমিকা হলো যেন ভগ্নদূতের ভূমিকা– যাকে দেখে আসন্ন বিপদের কথা আঁচ করা যায়। এরা যেন প্রতিকূল পরিবেশে সবার আগে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা তাদের মধ্যে বিপর্যয়ের শুরুতেই এমন প্রতিক্রিয়া হয় যা সহজে চোখে পড়ে। পাখি, বিশেষ করে সামুদ্রিক পাখি, এমনি ভাবে আসন্ন পরিবেশ দুর্যোগের চিহ্ন বহন করে তার নানা বৈকল্য দেখিয়ে। তাই তাদেরকে নির্দেশক প্রজাতি বলা হয় (ইনডিকেটর)।

গবেষণার কিছু উপায়

শারীরবৃত্ত নিয়ে পরীক্ষা

এক একটি ইকোসিস্টেমে জীববৈচিত্রকে বুঝতে হলে ওখানে বিভিন্ন প্রজাতিগুলো পরস্পরের সঙ্গে এবং পরিবেশের সঙ্গে কী রকম বিক্রিয়া করছে তা জানা দরকার। এজন্য ওখানে যে যেমন অবস্থায় আছে সে অবস্থাতেই তার উপর পরীক্ষণ চালাবার সুযোগ থাকা চাই। পরীক্ষণের অনেকখানিই হবার কথা প্রজাতিগুলোর শারীরবৃত্ত নিয়ে– অর্থাৎ তার শরীরের গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াগুলো কী ভাবে কাজ করছে, তা নিয়ে। শরীরকে বেশি প্রভাবিত না করে বাইরে থেকে এটি করার ভাল উপায় হলো এই জীবগুলো পরিবেশের সঙ্গে যে গ্যাস বিনিময় করছে তা মাপার চেষ্টা। যেমন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সালোক সংশ্লেষণে তা বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিয়ে অক্সিজেন ত্যাগ করছে, আর শ্বসনে অক্সিজেন নিয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। এই সব গ্যাস বিনিময়ের পরিমাণ ও তীব্রতা সূক্ষ্মভাবে মাপতে পারলে একটি বনভূমিতে নানা উদ্ভিদের বৈচিত্র ও তাদের পারস্পরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা যায়।

সেক্ষেত্রে বনের বহু বৃক্ষের পাতায় শাখায় গড়া পুরো শামিয়ানার উপর থেকে ওসব গ্যাসের বিনিময় সূক্ষ্মভাবে মাপা হয়। আবার এক একটি উদ্ভিদ প্রজাতিকে ছোট বদ্ধ পরিসরে রেখে তার পাতার গ্যাস বিনিময়ও মাপা যায়। ওভাবে ছোট্ট আকারে বদ্ধ সীমিত পরিসরের সৃষ্ট ব্যবস্থাকে বলা হয় ইকোট্রোন। এই উভয় ধরনের পরিমাপের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে গাণিতিক মডেল রয়েছে। এই সব কিছু প্রয়োগ করে গ্যাস বিনিময়ের তথ্য থেকে বনে প্রজাতির বন্টন, তাদের স্বাস্থ্য ও প্রাচুর্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এ ধরনের পরিমাপ করার জন্য আজকাল ছোট আকারের গ্যাস বিশ্লেষক যন্ত্র রয়েছে যার উপাত্ত সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষণের জন্য এতে অন্তর্ভূক্ত মাইক্রোপ্রসেসরও রয়েছে। সালোক সংশ্লেষণ ও শ্বসনে যেরকম অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরীক্ষিত হয়, প্রস্বেদনের ক্ষেত্রে সে রকম জলীয় বাষ্প, বায়ুদূষণের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে সালফার-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড ইত্যাদি।

দূর থেকে পরীক্ষা

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এক জায়গায় গ্যাস বিনিময় দেখে জীববৈচিত্র গবেষণার কাজ করা যায়। কিন্তু বন্য জীবন যাপনরত প্রাণির ক্ষেত্রে সেটি সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় দূর থেকে পরীক্ষা করা– যাকে বলা হয় টেলিমেট্রি বা দূর পরিমাপ।

এর জন্য পরিমাপ যন্ত্রগুলো প্রাণির দেহের সঙ্গেই সংলগ্ন করে দেয়া হয়। আর পরিমাপের পাওয়া তথ্যগুলো পরীক্ষণকারী বিজ্ঞানীর কাছে পৌঁছাতে ব্যবহার করা হয় প্রাণির দেহ সংলগ্ন ছোট রেডিও ট্রান্সমিটার। যন্ত্রপাতির মধ্যে থাকে জিপিএস (গ্লোবাল পজিশনিং সিষ্টেম) যা প্রতি মুহূর্তে প্রাণিটি কোথায় আছে সেই জায়গাটির একেবারে সঠিক ঠিকানা দিয়ে দেয় অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ আর উচ্চতার মাপে। অধিকাংশ তথ্য যা পাঠানো হয় তা ঐ শারীরবৃত্ত নিয়েই। এর মধ্যে কিছু কিছুতো শরীর থেকে সরাসরি সিগন্যালের আকারেই পাওয়া যায়। তাই বিবর্ধিত করে রেডিও ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়া হয়– যেমন হার্টের কাজ জানতে ইলেক্ট্রো-কার্ডিয়োগ্রাম। অন্যগুলো যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করে তাকে বৈদ্যুতিক সিগ্ন্যালে রূপান্তরিত করে তারপর পাঠানো হয়। এর মধ্যে আছে রক্তচাপ, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার, নিশ্বাসে নানা গ্যাসের আংশিক চাপ ইত্যাদি।

এসব তথ্য প্রাণিটির বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আসছে আর সেই অনুযায়ী বদলাচ্ছে। এটি যখন বিশ্রামে আছে, বা ঘুমাচ্ছে তখন এক রকম; তেমনি যখন উড়ছে, সাঁতার কাটছে, হাঁটছে, দৌড়াচ্ছে তখন আবার অন্যরকম হচ্ছে। সব তথ্য নিয়মিত আসতে থাকে। যে সব ট্রান্সমিটারের জোর কম সেক্ষেত্রে গ্রাহক যন্ত্রের এন্টেনা নিয়ে যথাসম্ভব প্রাণিটিকে অনুসরণ করতে হয় কাছাকাছি থাকার জন্য। কিন্তু আজকাল জোরালো ট্রান্সমিটার আর উপগ্রহ রীলের সুযোগ নিয়ে বহু দূর চলে যাওয়া পাখি বা জলজ প্রাণির ক্ষেত্রেও তথ্যগুলো একই স্থির গবেষণা কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে। শুধু তাই নয়, যাতে করে একই সঙ্গে নানা জায়গার বহু বিজ্ঞানী এই তথ্য পেতে পারেন গবেষণার জন্য, সে জন্য প্রাণীটি থেকে প্রাপ্ত সব তথ্য ইন্টারনেটে দিয়ে দেয়া হয়– যার ফলে যে কোন সচেতন মানুষ ইচ্ছে করলে ঐ প্রাণিটির সব খবর নিত্য পেতে পারবে। সামুদ্রিক কাছিম হুমকিতে থাকা প্রাণিদের একটি– তাই দুনিয়ার নানা জায়গায় তার পরিস্থিতি নিয়ে অনুসন্ধান চলছে। ২০১০ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশের সোণাদিয়া দ্বীপে পাওয়া যাওয়া একটি সামুদ্রিক কাছিমকে টেলিমেট্রি যন্ত্র সংলগ্ন করে ওখানকার সমুদ্রে ছেড়ে দেয়া হয়েছে 'উর্মি' এই নাম দিয়ে। তারপর থেকে বহুদিন যে কেউ ইন্টারনেটের সঠিক ওয়েবসাইটে গেলেই উর্মি এখন সমুদ্রের কোথায় আছে জানতে পেরেছেন। বিজ্ঞানীরা উর্মির শারীরিক অবস্থা ও তার আচরণ নিয়ে নিয়মিত বিস্তারিত তথ্য পেয়েছেন।

ট্রান্সমিটার সহ টেলিমেট্রির যন্ত্রপাতি প্রাণিটির শরীরের বাইরে সংলগ্ন থাকতে পারে, আবার শরীরের মধ্যেই ক্ষুদ্রাকৃতি যন্ত্রপাতি স্থাপন করা যেতে পারে। স্থলের বড় প্রাণিদের গলায় সাধারণত কলারের আকারে যন্ত্রপাতিগুলো পরানো

হয়। পাখির ক্ষেত্রে এক সময় শুধু রাডার দিয়ে সীমিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা যেত। এখন উপগ্রহের সুবিধা নিয়ে সার্বক্ষণিক তথ্য পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। বিশেষ করে দীর্ঘ পথ অতিক্রমকারী পাখির ক্ষেত্রে শরীরের বাইরে অপেক্ষাকৃত ভারী যন্ত্রপাতি লাগালে তার স্বাভাবিক গতি ইত্যাদি ব্যাহত হয়। তাই আজকাল শরীরের ভেতরে স্থাপনের জন্য ক্ষুদ্রাকৃতির নানা যন্ত্রপাতি বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। জলজ প্রাণির ক্ষেত্রে পানির মধ্যে রেডিও তরঙ্গ অচল বলে সেখানে সব কিছু আলট্রাসোনিক শব্দ তরঙ্গে রূপান্তরিত করে সম্প্রচার করা হয়।

কখন কোথায় কী ভাবে আছে

জীববৈচিত্রের গবেষণায় গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের (জি পি এস) ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর দ্বারা কয়েকটি ভূ-উপগ্রহের সহায়তায় জীবের অবস্থানটি কয়েক মিটারের মধ্যে সুনির্দিষ্ট করা যায় পৃথিবীর যে কোন জায়গায়। টেলিমেট্রিতে এটি সংশ্লিষ্ট প্রাণিটির অবস্থান সব সময় আমাদেরকে জানিয়ে রাখতে পারে। এজন্য একটি ছোট জিপিএস যন্ত্র সব সময় টেলিমেট্রি যন্ত্রে আজকাল সন্নিবেশিত থাকে।

তবে জীববৈচিত্র সম্পর্কিত কাজে জিপিএসএর অন্যান্য রকম ভূমিকাও রয়েছে। যেমন বিশাল বাদল বনের কোথাও যখন স্থানীয় বন বিনষ্টি ঘটে তখন তার স্থান ও পরিস্থিতি জানা প্রয়োজন। এজন্য বন ধ্বংসের ফলে যে জায়গাটি খালি হলো সেখানে তার বিভিন্ন সীমায় জিপিএস স্থাপন করা হয়। ফলে সহজে সেগুলো থেকে সিগন্যাল নিয়ে এক জায়গায় বসেই এরকম প্রতিটি বিনষ্টির ঘটনার ব্যাপ্তি জানা যায়, কীভাবে তা বৃদ্ধি পাচ্ছি তাও। অন্যদিকে মহাসমুদ্রের উন্মুক্ত নানা অঞ্চলে জীববৈচিত্র নিয়ে গবেষণায়ও জিপিএসএর ভিন্নতর ব্যবহার রয়েছে। এরকম এক একটি জায়গায় সমুদ্রের বিভিন্ন গভীরতায় নানা সামুদ্রিক জীবের জীবন যাপন নিয়ে গবেষণার সময় ঐ জায়গাটির অবস্থানকে সব সময় সুনির্দিষ্ট রাখা প্রয়োজন। এর সব চেয়ে সহজ উপায় হলো ওখানটায় ছোট একটি জিপিএস স্থাপন করা ও সব সময় এর অবস্থানটি পরীক্ষার অঞ্চলের সুনির্দিষ্ট অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে রাখা। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা প্রয়োজন মত সমুদ্রের ঐ সুনির্দিষ্ট এলাকায় যেতে পারেন আবার ঐ জিপিএসএরই সহায়তা নিয়ে।

সমুদ্রে আরো জটিল পরিস্থিতিতেও এর ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন সামুদ্রিক জীবের পরিস্থিতি অনেক সময় সঙ্গে ওখানকার স্থানীয় স্রোতধারার উপর নির্ভর করে। এজন্য স্রোতধারা সম্পর্কে পরীক্ষণ প্রয়োজন হয়। স্রোতধারা মাপার একটি উপায় হলো স্থানীয় ভাবে পানিতে রঙ দিয়ে সেই রঙীন পানির চলাচল

লক্ষ্য করা। তার সঙ্গে

টেলিমেট্রির মাধ্যমে সুন্দরবনে বাঘ অনুসরণ

জিপিএস যন্ত্রকেও ভাসমান করলে ঐ পানির গতিবিধি পরিমাপ ও স্রোতধারা নির্ণয় সহজ হয়ে পড়ে।

জিপিএস এর ব্যবহার আসলে সার্বিকভাবে জরুরী হয়ে উঠে জীববৈচিত্রের ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে। সংক্ষেপে জিআইএস (জিওগ্রাফিকাল ইনফরমেশন সিষ্টেম) নামে পরিচিত এই ব্যবস্থাকে সনাতন মানচিত্রের একটি আধুনিক ও ব্যাপকতর রূপ বলা যেতে পারে। এতে সাধারণ নক্শার মানচিত্রের বদলে বিভিন্ন পর্যায়ের ডিজিট্যাল তথ্য সমন্বয়ে একই স্থানের আরো তথ্যঘন একটি চিত্র পাওয়া যায়। কম্পিউটারের সহায়তায় খুবই সমৃদ্ধ ও সহজ ব্যবহারযোগ্য একটি ব্যবস্থা হয়ে উঠতে পারে। জীববৈচিত্রের গবেষণার ক্ষেত্রেও এরকম জিআইএস বড় সহায়ক হতে পারে। কোন্ বিশেষ প্রজাতির সদস্যরা ইকোসিষ্টেমে কী ভাবে বন্টিত রয়েছে, এদের বন্টনের সঙ্গে অন্য প্রজাতির বন্টনের কী ধরনের সম্পর্ক রয়েছে, বা আদৌ কোন সম্পর্ক আছে কিনা, এসব জি আই এস থেকে বুঝা যায়। পরিবেশের বিভিন্ন দিকের বন্টনের সঙ্গেও বা জীববন্টনের সম্পর্কটি কী রকম জিআইএস থেকে তা খুব সহজে ধরা পড়ে এবং গবেষণা সহজতর হয়। উদাহরণ স্বরূপ ২০০৪ সালের বাঘ শুমারির সময় সুন্দরবনের নানা জায়গায় গাছপালার বন্টন কী রকম ছিল এবং তার সঙ্গে বাঘের বন্টনের সম্পর্ক কী ছিল তা তখন সৃষ্ট জি আই এস থেকে স্পষ্ট হয়েছে। এর পরের বছরগুলোতে এক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলো এসেছে তাও ঐ একই জি আই এস'এ

জি আই এস ম্যাপিং এ নানা তথ্য স্তর

সন্নিবেশিত করা সম্ভব হয়েছে। তাতে বিষয়টির চলমান গতি প্রকৃতিটি সহজে ধরা পড়ে। এভাবে জি আইএস এর একটি বড় সুবিধা হলো সাধারণ মানচিত্র যেখানে অনড় একটি জিনিস, জিআইএস সেখানে সব সময় হাল নাগাদ হয়ে থাকতে পারে, কম্পিউটারে নানা তথ্যের বদলে যাবার মাধ্যমে। কাজেই ঐ প্রজাতির বন্টন কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তাও সেখানে ধরা পড়ে। তাছাড়া ধরা যাক একটি বসত বিন্যাস– অর্থাৎ বসত টুকরা-গুলোর আকার আকৃতি ও অবস্থান এবং এদের মধ্যে করিডরগুলো, কীভাবে এক একটি প্রজাতির সদস্যদের যাতায়াতকে প্রভাবিত করছে তা জানতে চাই। কিংবা একটি জীবসমাজ কীভাবে আর একটি জীবসমাজের এলাকার মধ্যে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়েছে– এসব জিনিস লক্ষ্য করার জন্য জি আই এস রূপে তথ্য গুলো রাখলে গবেষণাটি অনেক সহজ হয়।

দূর অনুধাবনের ব্যবহার

জীববৈচিত্রকে অনেক ক্ষেত্রেই পর্যবেক্ষণ করতে হয় কাছে থেকে নয় বরং অনেক দূর থেকে একটি ব্যাপক দৃশ্যপটের আকারে। যেমন একটি বিস্তৃত বাদল বনে (রেইন ফরেষ্ট) কী ঘটছে তা জানতে এখানে ওখানে বনের অংশ বিশেষ শুধু পরীক্ষা করলেই যথেষ্ট হয়না। এর ব্যাপক দৃশ্য পর্যবেক্ষণের ও তাতে ঘটা পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করার সুযোগ থাকা দরকার। বিমান, উপগ্রহ ইত্যাদি থেকে ছবি তুলে এটি সম্ভব। বিমানের ছবিগুলো অপেক্ষাকৃত কাছে থেকে তোলা ছবি। তাই এতে নানা শস্য, নানা বৃক্ষের বন, মাটির প্রকৃতি, ছোট জলধারা, রাস্তাঘাট, নানা উদ্ভিদ সমৃদ্ধ এলাকা, পাখি ইত্যাদির ব্যাপক বসত বা বিশেষ বিশেষ প্রাণি সমাবেশ ইত্যাদিকে আলাদা করা যায়।

তবে আরো ব্যাপক ও নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এখন সম্ভব হয়েছে উপগ্রহের কল্যাণে। উপগ্রহ থেকে সাধারণত ইনফ্রারেড আলো অথবা মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে ছবি নেয়া হয়। অপেক্ষাকৃত ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘের ইনফ্রারেডের সাহায্যে পানি, উদ্ভিদের প্রকৃতি, বিভিন্ন উদ্ভিদ ক্ষেত্র ইত্যাদি স্পষ্ট করা যায়। একটু বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘের ইনফ্রারেড দিয়ে উষ্ণতার তারতম্যগুলো ভাল বুঝা যায়। উষ্ণতর অঞ্চলের জন্য মাইক্রোওয়েভের ছবি বেশি সুবিধাজনক।

বার বার একই এলাকাকে ব্যাপক ভাবে দেখে তাতে পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করার জন্য উপগ্রহ ভিত্তিক দূর অনুধাবনের কোন বিকল্প নাই। তবে বিশাল এলাকার সার্বিক জীবসমাজের উপর গবেষণার জন্য এরকম দূর অনুধাবন সুবিধাজনক হলেও এক একটি প্রজাতির উপর বিস্তারিত পরীক্ষণের জন্য সেখানে গিয়ে কাছে থেকে গবেষণাই একমাত্র উপায়। প্রত্যেকটি বসত, প্রত্যেকটি আচরণ সেখানে

পরীক্ষণের বিষয় হতে পারে। সেক্ষেত্রে অনেক কিছুই প্রত্যক্ষভাবে সুকৌশলে পরিমাপ করা যায়। দেহের ওজনের তারতম্য, দেহনিসৃত নানা বস্তু ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে ঐ পরিবেশে, ঐ জীবসমাজে প্রজাতিটির পরিস্থিতি নির্ণয় করা যায়।

দলে সদস্য কত

একই প্রজাতির নানা দলে সদস্য সংখ্যা

ইকোসিষ্টেমে জীবসমাজের মধ্যে এক একটি প্রজাতির সদস্যরা একাকীও থাকেনা আবার সবগুলো মিলে একত্রেও সব সময় থাকেনা। সাধারণত এরা থাকে বেশ কিছু দলে বিভক্ত হয়ে। অবশ্য বিভিন্ন দলগুলোর মধ্যে মেলামেশার ও প্রজননগত সম্পর্কের সুযোগ থাকে। ওখানে প্রজাতিটির সার্বিক পরিস্থিতি দেখতে গেলে এর একটি দলের সদস্য সংখ্যাটি জানা গুরুত্বপূর্ণ। দলের সদস্য সংখ্যা (পপ্যুলেশন) অস্বাভাবিক রকম কমে গেলে প্রজাতিটি বিলুপ্তির হুমকিতে পড়ে। তা ছাড়া এর ফলে ঐ জীবসমাজের ভারসাম্যও ব্যাহত হয় যার ফলে অন্য প্রজাতিগুলোর উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। অন্যদিকে কোন প্রজাতির দলগুলোতে সদস্য সংখ্যা অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেলেও ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে একই রকম সমস্যা সৃষ্টি হয়। একটি প্রজাতি বিলুপ্তির হুমকিতে যাওয়া নির্ভর করে তার দলগুলোর পপ্যুলেশন ক্ষয়িষ্ণু হয়ে যাওয়ার উপর। দলের সদস্য সংখ্যার অতিরিক্ত হ্রাস-বৃদ্ধি উভয়েই এই ক্ষয়িষ্ণু হবার প্রথম ধাপ। তাই ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ।

দলের পপ্যুলেশন বা সদস্য সংখ্যা জন্ম হার, মৃত্যু হার, অন্য দলে অভিবাসনে চলে যাওয়া ও অন্য দল থেকে আসার উপর নির্ভর করে। সাধারণত অভিবাসনে যাওয়া আর আসার হার মোটামুটি একই হয় বলে শেষ পর্যন্ত জন্ম হার ও মৃত্যু হারের পার্থক্যটাই সদস্য সংখ্যা ঠিক করে দেয়। একটি সদস্য তার জীবনকালে অনেকবার প্রজনন করে বলে সাধারণ নিয়মে পপ্যুলেশন গুণোত্তর হারে দ্রুত ক্রমাগত বাড়তেই থাকার কথা। কিন্তু একটি পরিবেশ প্রজাতিটির সর্বোচ্চ কত সদস্য ধারণ করতে পারে তার একটি উর্দ্ধসীমা থাকে। কাজেই শেষ পর্যন্ত সদস্য সংখ্যা একটি স্থিতিশীল অবস্থায় চলে আসে। অতিরিক্ত বেড়ে গেলে খাদ্য, বাসস্থান, জীবন যাত্রা ইত্যাদিতে যে সংকট সৃষ্টি হয় তার ফলেই এই সীমাটি দেখা দেয়। কোন কোন সময় এটি অবশ্য খুব মসৃণ ভাবে ঘটেনা। কখনো পপ্যুলেশন অতি দ্রুত বেড়ে তুঙ্গে উঠে, তারপর বড় ধরনের হঠাৎ বিপর্যয় ঘটে এটি ধসে পড়ে।

স্পষ্টত দলগুলোর সদস্য সংখ্যা বেড়ে গেলে বা কমে গেলে অর্থাৎ পপ্যুলেশন ঘনত্বে পরিবর্তন ঘটলে এর একটি প্রতিক্রিয়া হয় সদস্য সংখ্যার উপর। অতিরিক্ত ঘনত্বে সদস্য সংখ্যা কমার সম্ভাবনা বাড়ে, আর কম ঘনত্বে বাড়ার

সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় স্বাভাবিক ক্ষেত্রে। কারণ ঘনত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণত জন্মহার কমে, মৃত্যুহার বাড়ে– সম্পদের সীমাবদ্ধতার ফলে। এটি হলো সদস্য সংখ্যার ঘনত্ব-নির্ভর পরিবর্তন। কিন্তু আবার পপ্যুলেশনের কোন কোন পরিবর্তন ঘনত্ব-নির্ভর নয়– যেমন প্রতিকূল আবহাওয়া, দুর্যোগ, মানুষের হস্তক্ষেপ ইত্যাদি কারণে যখন পরিবর্তন ঘটে। কীট-পতঙ্গের ক্ষেত্রে দ্রুত সদস্য-সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণের সুযোগ বেশি– তাই গবেষণাও হয়েছে তাদের নিয়েই বেশি। কিন্তু সেখানেও নানা রকম ভিন্ন ফলাফল দেখা গেছে। যেমন কোন কোন প্রজাতির ক্ষেত্রে সদস্য সংখ্যা দীর্ঘ ৫০ বছরে বড় জোর দ্বিগুণ বা তিনগুণ হয়েছে কিংবা ঐ পরিমাণে কমেছে। কিন্তু আবার কোন প্রজাতির ক্ষেত্রে ২০ বছরে সদস্য সংখ্যা ২০ হাজার গুণ বাড়তে বা কমতে দেখা গেছে! ঘনত্ব-নির্ভরশীলতা এক রকম নিয়ন্ত্রকের কাজ করে– তা সদস্য সংখ্যার বাড়া কমাকে একটি সীমার মধ্যে রাখে। গবেষণায় দেখা গেছে পরিবেশ যদি মিশ্র প্রকৃতির হয়, আর প্রজাতির বিভিন্ন দলগুলোর মধ্যে সংযোগ যদি দুর্বল হয় সেখানে বাড়া কমার গণ্ডিটি ছোট হয়। পপ্যুলেশন সেখানে অপেক্ষাকৃত বেশি স্থিতিশীল থাকে।

কিন্তু যেখানে ঘনত্ব-নির্ভরশীলতাটি বেশি কাজ করেনা, সেখানে হ্রাস-বৃদ্ধির কোন সীমা থাকেনা– পপ্যুলেশন এক এক সময় তুঙ্গে উঠতে পারে আবার অন্য সময় দ্রুত ধসে পড়তে পারে, এমনকি বিলুপ্তির পথেও যেতে পারে। মানুষের হস্তক্ষেপে বিভিন্ন জীবপ্রজাতির ভাগ্যে যা ঘটছে তার ফলে ঐ ঘনত্ব-নির্ভর ব্যাপারটি আর কাজ করছেনা। তাছাড়া আবার প্রধানত মানুষের কারণেই পরিবেশ ক্রমে তার মিশ্র প্রকৃতি হারিয়ে ফেলছে। মানুষের কর্মকাণ্ডের প্রবণতাটি হলো পরিবেশকে স্থানীয় ভাবে বিচিত্র রকমের থেকে এক রকম করে ফেলা– হয় সব কৃষি জমিতে, একই শস্যে, একই উদ্ভিদে, একই ভাবে নগরায়নে বা মানব বসতিতে। মানুষের হস্তক্ষেপে একটি প্রজাতির বিভিন্ন দল বিভিন্ন টুকরায় আবদ্ধ হয়ে পড়ছে, পরস্পর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে দুর্বল সংযোগ রাখাও দুরূহ হচ্ছে। এতেও এক এক জীবের সদস্য সংখ্যায় ঘনত্ব-নির্ভরশীলতাটি কমে গিয়ে ভারসাম্যহীন পরিবর্তন ঘটার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

ক্ষয়িষ্ণু প্রজাতি নিয়ে গবেষণাঃ ফোটাদার প্যাঁচা

যুক্তরাষ্ট্রের একটি পরিচিত পাখি ফোটাদার প্যাঁচার (স্পটেড আউল) সংখ্যা গত শতাব্দীতে দ্রুত কমে মাত্র ২০ শতাংশ গিয়ে ঠেকেছে। এর প্রধান কারণ এই প্যাঁচার বসতগুলো টুকরা টুকরা হয়ে যাওয়া। শুমারির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করার পর একে রক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট উপায় উদ্ভাবনের জন্য বেশ কিছু গবেষণা সেখানে হয়েছে। বুঝা গেছে যে তাদের বসত বর্তমানে বিচ্ছিন্ন যে টুকরাগুলোতে

এসে ঠেকেছে সেগুলোর মধ্যে সংযোগের ব্যবস্থা করেই একমাত্র একে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচানো যেতে পারে। এ কাজের জন্য কর্মপন্থা ঠিক করার স্বার্থে ১৯৯২ এর দিকে এর সম্ভাব্য স্থানিক বিস্তারের উপর একটি গাণিতিক মডেল খাড়া করা হয়েছিল যার মাধ্যমে কম্পিউটার বলে দিতে পারে কোথায় কী করতে হবে। এজন্য খানিকটা সরাসরি পর্যবেক্ষণ, খানিকটা টেলিমেট্রির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হলো ফোটাদার প্যাঁচার জোড় বাঁধার হার, প্রজনন উর্বরতা, মাঠ পর্যায়ে টিকে থাকার হার, বিস্তার প্রকৃতি– ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে।

মডেলটি বলে দিল যে এই প্রজাতিকে রক্ষা করতে হলে একটি সুনির্দিষ্ট নিম্নসীমার উপরে এর সদস্য সংখ্যা বজায় রাখতেই হবে। এ সীমার নিচে চলে গেলে কিছুতেই একে বাঁচানো যাবেনা। এজন্য কী করতে হবে সেই কর্মপন্থাও ঠিক হয়ে গেল। এ জন্য প্রাসঙ্গিক বনগুলোর মধ্যে এই প্যাঁচার অনেকগুলো নূতন বসত টুকরার সৃষ্টি করতে হবে– যেগুলো পরস্পরের ২০ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বে হবেনা– যাতে টুকরাগুলোর মধ্যে তাদের যাতায়াতের একটি সুযোগ থাকে। এরকম এক একটি টুকরায় প্যাঁচাটির অন্তত ২০টি সদস্য থাকবে। তাদের জীবন ধারন, প্রজনন, ন্যূনতম বিস্তার এই সব কিছু ব্যবস্থার মাধ্যমেই চলেছে এই একটি প্রজাতি রক্ষার জন্য বিপুল আয়োজন।

বাংলাদেশে বাঘ শুমারি

শুধু মাত্র একটি বনাঞ্চলে একটি প্রজাতির সদস্য সংখ্যার উপর সঠিক নজর রাখার জন্য বাংলাদেশে ২০০৪ সালে আয়োজন করা হয়েছিল আধুনিক পদ্ধতির বাঘ শুমারি। আগেই দেখেছি একটি কী-স্টোন প্রজাতি হিসাবে ইকোসিস্টেমে

বাঘ শুমারিতে পায়ের ছাপ সংগ্রহ

বাঘের বিলুপ্ত হওয়াটি অন্যান্য প্রজাতিগুলোর জন্যও কী ভাবে দুঃসংবাদ বহন করে আনে। বাঘ নিয়ে বিশেষ দুশ্চিন্তাটির কারণ রয়েছে বৈকি। সাম্প্রতিক অতীতেও বাঘের নয়টি উপ-প্রজাতি থাকলেও এখন টিকে রয়েছে মাত্র পাঁচটি– সাইবেরিয়ান, ইন্দোচাইনিজ, সুমাত্রান, সাউথ চাইনিজ এবং রয়্যাল বেঙ্গল। নিজ নিজ প্রাকৃতিক অবস্থানে এদের প্রত্যেকটির অবস্থা এখন হুমকির মুখে। এজন্যই সুন্দরবনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যাটি জানা এত জরুরী ছিল। একটি উদাহরণ হিসাবে আমরা এই বাঘ শুমারির প্রক্রিয়াটি আলোচনা করতে পারি।

বাংলাদেশের সুন্দরবনকে ৫৫টি এলাকায় ভাগ করে ৭ দিনের ভেতর তার প্রত্যেকটিতে পায়ের ছাপ অনুসন্ধানের মাধ্যমে শুমারি চালানো হয়েছে। জিপিএস এর সাহায্যে এক একটি এলাকার সীমানা সরজমিনে চিনে নেয়া হয়েছে। এলাকাগুলো স্থানীয় খাল দিয়ে পরস্পর থেকে পৃথক করা রয়েছে– ফলে এদের একটি থেকে অন্যটিতে বাঘের চলাচল কিছুটা সীমাবদ্ধ। ১০ জনের এক একটি শুমারি দল একই সময়ে প্রত্যেক এলাকায় বাঘের পায়ের ছাপ অনুসন্ধান করেছেন, এবং সেই ছাপ থেকেই বাঘের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে। চার পায়ের ছাপের পারস্পরিক অবস্থান থেকে কদমের দৈর্ঘ, দিক, হাঁটার ভঙ্গি ইত্যাদি জানা গেছে। এগুলো ছাড়াও রেকর্ড করা হয়েছে আনুসঙ্গিক অন্যান্য তথ্য– জিপিএস দিয়ে ছাপের সঠিক অবস্থান, তারিখ, আনুসঙ্গিক উদ্ভিদ পটভূমি ইত্যাদি। প্লাষ্টার অব প্যারিস দিয়ে পায়ের ছাপের প্রতিকৃতি নেয়া হয়েছে যার ত্রিমাত্রিক ছবি পরে কম্পিউটারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে। পায়ের ছাপের বিশ্লেষণ

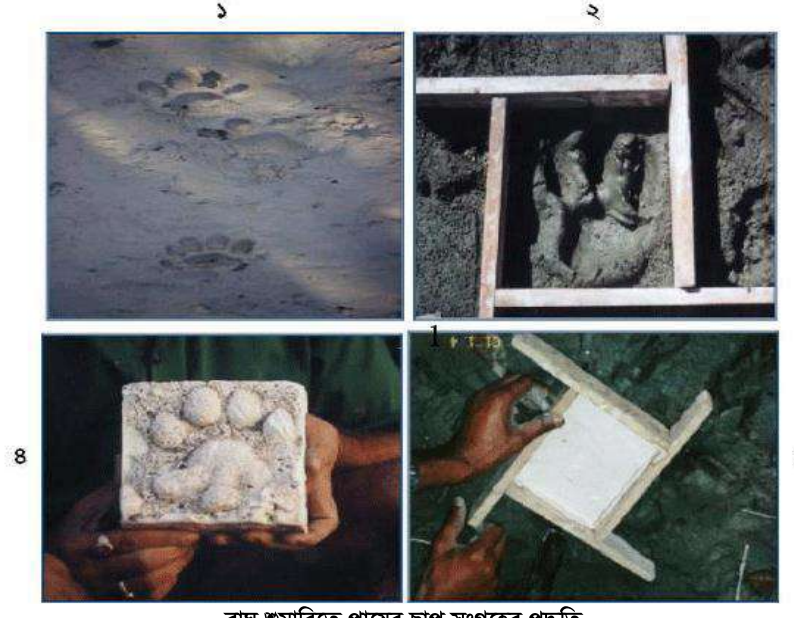

বাঘ শুমারিতে পায়ের ছাপ সংগ্রহের পদ্ধতি

থেকে বাঘটির লিঙ্গ এবং তা শিশু না পূর্ণ বয়স্ক তাও জানা সম্ভব হয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে শুধু পেছনের বাম পায়ের ছাপটি নেয়া হয়েছে। এর কারণ পেছনের বাম পায়ের ছাপটি অপেক্ষাকৃত ভাল ও সম্পূর্ণ ভাবে পড়ে। এভাবে মোট ১৫৪৬টি ছাপ নেয়া হয়েছে এর মধ্যে ৯৮% বয়স্ক বাঘের, ২% শিশু বাঘের। পদচিহ্নের সংখ্যা যত তার থেকে বাঘের সংখ্যা অনেক কম হবে, কারণ একই এলাকায় তো বটেই, বিভিন্ন এলাকায়ও একাধিক ছাপ আসলে একই বাঘের হতে পারে। হাঁটার দিক ইত্যাদি থেকে একই পয়েন্টে একই বাঘের একটি ছাপই অবশ্য নেয়া হয়েছে। এভাবে একটি ছাপ থেকে তার মালিক একটি টার্গেট বাঘকে চিহ্নিত করা হয়। কম্পিউটারের এমন সফটওয়্যার রয়েছে যা এই টার্গেট বাঘের ছাপের সঙ্গে ঐ এলাকায় বা সংলগ্ন এলাকায় অন্য ছাপগুলোর তুলনা করে দুটি একই বাঘের হলে দুবার না গুণার ব্যবস্থা করে। কম্পিউটারে সব তথ্য থেকে এবার ম্যাপ তৈরি হয় বিভিন্ন বাঘের অবস্থান বন্টনসহ। মাটির প্রকৃতি, জোয়ারের সময়, পদচিহ্নের প্রকৃতি ইত্যাদি মিলিয়ে ঠিক হয় পায়ের ছাপটি কবেকার তা। টার্গেট বাঘ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সেই তথ্যটিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এভাবে শুমারিটি যথেষ্ট নির্ভুলভাবে সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র পায়ের ছাপ দেখেই। ৩২টি দলে বিভক্ত মোট ৩২০ জনের জরিপ দলের সদস্যরা ঐ জরিপ কালে সত্যি বাঘের সাক্ষাৎ পেয়েছেন মাত্র সাতবার।

বাঘ শুমারি থেকে জানা গেছে ওসময় সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ছিল ৪১৯টি। পুরুষের চেয়ে স্ত্রী বাঘের সংখ্যা দ্বিগুণের কিছু বেশি। বাঘগুলো সুন্দরবনের সব এলাকাতে মোটামুটি সমানভাবে বন্টিত ছিল, গড়পড়তা প্রতি ১৪ বর্গ

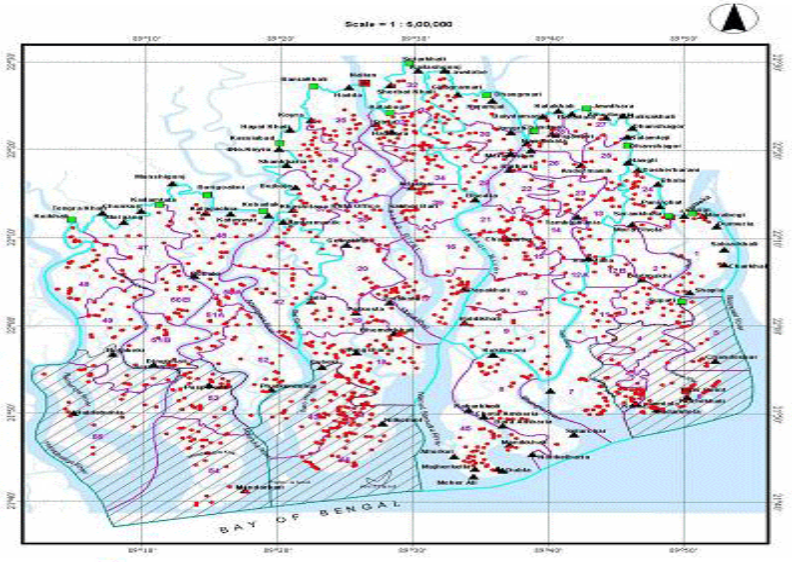

বাঘ শুমারিতে সংগৃহীত পায়ের ছাপের স্থান সমূহ

কিলোমিটার জায়গার মধ্যে একটি বাঘ। ইতোপূর্বের শুমারিগুলো এত বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালিত না হওয়ায় তার সঙ্গে এই সংখ্যার তুলনা করা কঠিন। আগে প্রধানত বনের কয়েকটি জায়গায় নমুনা জরিপ করে পুরো বনে বাঘের সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা নেয়া হতো। তবে ওভাবে নির্ণিত ১৯৮০ সালের ৪৫০টি বাঘ এবং ১৯৯২ সালের ৩৫৯টি বাঘের সঙ্গে এটি মোটামুটি সঙ্গতি সম্পন্ন।

জীব শুমারির নানা উপায়

বাঘ শুমারির ক্ষেত্রে যা করা হয়েছে সেভাবে পুরো এলাকাকে অনেকগুলো বর্গক্ষেত্রে ভাগ করে ফেলে এদের মধ্যে ইতস্তত নমুনাতে অথবা সম্ভব হলে সবগুলোতে সদস্য সংখ্যা গুণে মোট সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। নমুনা বর্গক্ষেত্রগুলোর থেকে বাছাই করার সময় যদি লটারির মত সম্পূর্ণ ইতস্তত ভাবে তা করা হয় তা হলে এগুলোর অল্প কয়েকটিতে গুণে পুরো এলাকার সংখ্যা সম্পর্কে মোটামুটি নির্ভুল ধারণা পাওয়া যায়। তবে এই পদ্ধতি সফল হবে শুধু নিশ্চল বা অল্প সচল জীবের ক্ষেত্রে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এটি খুবই উপযোগী পদ্ধতি। শামুক ইত্যাদি খুবই ধীর গতির প্রাণির ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য– কারণ পরিমাপে যে সময় লাগে তার ভেতর তাদের নিজ বর্গক্ষেত্র ছেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। সুন্দরবনে বাঘের ক্ষেত্রে এটি সম্ভব হয়েছে কারণ বাঘের চলাফেরা খুব ব্যাপক নয়– বিশেষ করে অঞ্চলগুলো যখন স্থানীয় খাল দ্বারা বিচ্ছিন্ন। অন্যান্য অধিকাংশ প্রাণির ক্ষেত্রে অবশ্য এই পদ্ধতি কার্যকর হবেনা। এজন্য রয়েছে আরো অন্তত দুটি প্রধান উপায়।

ধরা যাক একটি পুকুরে একটি বিশেষ মাছ প্রজাতির সংখ্যা নির্ণয় করতে চাই। সেক্ষেত্রে জাল ফেলে সেই প্রজাতির মাছ যথেষ্ট ধরতে হবে এবং সেগুলোকে বিশেষ কোন চিহ্ন দিয়ে আবার ছেড়ে দিতে হবে। ঐ চিহ্নিত মাছগুলো এখন

পর পর ধরার সংখ্যা থেকে পোকার পপ্যুলেশন

সাধারণ মাছের মধ্যে একেবারে ইতস্তত মিশে যাবে। কিছু দিন পরে আবার মাছ ধরা হলে প্রতি ১০০টি ঐ মাছের মধ্যে কতগুলো চিহ্নিত মাছ পাচ্ছি তার থেকেই আন্দাজ করা যাবে পুকুরে ঐ মাছ কত আছে। এতে ধরে নেয়া হয় যে ঐ নূতন ধরা মাছের মধ্যে চিহ্নিত ও অচিহ্নিতদের যেই অনুপাত– পুরো পুকুরেও তাদের সেই অনুপাত থাকবে। কাজেই আগের বার কতগুলো মাছকে চিহ্নিত করে ছাড়া হয়েছিল সেই সংখ্যাই বলে দেবে মোট মাছের সংখ্যা কত। এই যে উভয় অনুপাত সমান হবে বলে ধরে নিলাম, সেটি ততই সঠিক হবে চিহ্নিত মাছের সংখ্যা মোট মাছের পরিপ্রেক্ষিতে যত বেশি হবে। তাই চেষ্টা করতে হবে পুকুরে মাছটির মোট সংখ্যার অন্তত ২০% মাছকে যেন ধরে চিহ্নিত করা যায়। এই পদ্ধতিটি শুধু পুকুরের মাছের জন্য নয়, একই এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে এবং যথেষ্ট সংখ্যায় ধরে চিহ্নিত করা যায় এমন যে কোন প্রাণির জন্য কার্যকর হবে।

নির্দিষ্ট ক্ষেতের বা বাগানের এলাকায় মোটামুটি সীমাবদ্ধ থাকে এমন পোকা-মাকড়ের ক্ষেত্রে সংখ্যা নিরূপণের জন্য অন্য একটি পদ্ধতি সুবিধাজনক। এতে একই ভাবে হাতে জাল ঘুরিয়ে ক্রমাগত যথেষ্ট পোকা ধরা হয় এবং তা একটি বোতলে বা বয়োমে জমা করা হয়। এভাবে কিছুক্ষণ পর পর একই ভাবে ধরলে আশা করা যায় যে প্রত্যেকবার কিছু কিছু কম পোকা ধরা পড়বে কারণ ইতোমধ্যে কিছু পোকা ধরে কমিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রত্যেকবার কতটি ধরা পড়লো, এবং ইতোমধ্যে বয়োমে কত পোকা জমা হয়েছে, এই দুটিকে যদি যথাক্রমে গ্রাফের x মান ও y মান ধরে বিন্দু স্থাপন করা হয়, তা হলে সব বিন্দু মোটামুটি একটি সরল রেখা তৈরি করবে। তাতে ধরা পড়া পোকা ক্রমে যত কম দেখা যাবে জমা পোকা ক্রমে তত বেশি। এবার এই সরল রেখাটি বর্ধিত করলে এক পর্যায়ে রেখাটি গ্রাফের জমা পোকার অক্ষটিকে ছেদ করবে। ঐ ছেদ করা বিন্দুটি জমা পড়ার যে সংখ্যাটি দেখাবে সেটিই পোকাটির বর্তমান সংখ্যা বলে ধরে নেয়া যায়। কারণ সত্যিসত্যি যদি ঐ বিন্দুতে পৌঁছানো যেত তা হলে এলাকার সকল পোকাই ধরা পড়ে বয়োমে চলে আসতো। এটিও অবশ্য মোটামুটি একটি ধারণা মাত্র শুধু দেবে কারণ নিয়মটি একেবারে ত্রুটিহীন ভাবে প্রয়োগ করা খুব কঠিন। কিন্তু উন্মুক্ত বাগানে ঘোরাফেরা করা পোকার সংখ্যা জানার আর সহজ উপায়ই বা কী?

প্রতিযোগিতা, সহযোগিতা

প্রতিযোগিতার মধ্যে যার যার সর্বোত্তম ব্যবস্থা

একই ইকোসিস্টেমে নানা প্রজাতির দলগুলো যখন বাস করে তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ও বিক্রিয়া ঘটে। এসব বিক্রিয়ার কিছু প্রতিযোগিতা, আবার কিছু সহযোগিতার রূপ নেয়। প্রতিযোগিতার বিষয়গুলোই আগে আলোচনা করি। বিভিন্ন দলের সদস্য সংখ্যা বাড়লে সীমিত সম্পদের ভোগ দখল নিয়ে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা স্বাভাবিক। এটি নানা ভাবে দেখা দিতে পারে। যেমন বনের মধ্যে নানা প্রজাতির গাছ সূর্যের আলো পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করে। যে প্রজাতির গাছ পারে সেটি দ্রুত বেড়ে নিজের ছায়া দিয়ে অন্য রকম গাছকে ঢেকে দিতে চায়– যার ফলে শেষোক্তগুলো বাড়তে পারে কম। প্রতিযোগিতা কখনো আবার সম্মুখ-যুদ্ধে পরিণত হতে পারে সম্পদে ভাগ বসাবার জন্য। অনেক সময় এটি শিকার-শিকারির প্রতিযোগিতাও হতে পারে– শিকারি শিকারকে ধরার, আর শিকার শিকারি থেকে পালাবার জন্য। সাধারণভাবে মনে হবে যে প্রতিযোগিতার মধ্যে যে প্রজাতির সক্ষমতা বেশি বলে প্রমাণিত হবে সেটিই সব সম্পদ দখল করবে– অন্য প্রতিযোগী প্রজাতিগুলো ওখানে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বনে সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল গাছগুলোই টিকে থাকবে, সম্মুখ-যুদ্ধে শক্তিশালীরাই টিকে থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ঘটেনা। প্রবলের সঙ্গে দুর্বলও টিকে থাকে– জীবসমাজে বৈচিত্র বজায় থাকে। এর ব্যাখ্যা করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকে বলা যায় সর্বোত্তম ব্যবস্থার তত্ত্ব (অপটিমাইজেশন থিওরি)। এ কথার মানে হলো প্রত্যেক প্রজাতি তার সবলতা ও দুর্বলতার এমন একটি অনন্য মিশ্রণে থাকার চেষ্টা করে যা তার জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা সৃষ্টি করে। এক এক প্রজাতির জন্য এই ব্যবস্থা এক এক রকম। আপাত অসুবিধার মধ্যেও কারো জন্য সুবিধা থাকে। তাই পরিবেশে সবার জায়গা হয়। সর্বোত্তম ব্যবস্থার তত্ত্বটি বুঝার জন্য একটি উদাহরণের সাহায্যে নেয়া যাক।

সীমিত জায়গায় কৃত্রিম ভাবে যখন আমরা ঘাসের ল'ন তৈরি করি তাতে এক রকম ঘাসই হয়, নানা রকম ঘাস জন্মায়না। সেখানে আমরা যে ঘাসটি লাগাই তা মাটির থেকে সব চেয়ে বেশি নাইট্রোজেন সার নিতে পারে, তাই আগন্তক অন্যগুলোকে প্রতিযোগিতায় হটিয়ে দেয়। ইকোসিস্টেমে বন্য তৃণভূমিতে কিন্তু তা হবেনা। ঐ সীমিত নাইট্রোজেন সার সত্ত্বেও সেখানে শতাধিক বিভিন্ন রকমের ঘাস পরস্পরের সঙ্গে সহঅবস্থান করতে পারে। এর কারণ শিকড় গড়ার কাজে ও প্রজননের কাজে যে পরিমাণ শক্তি বরাদ্দ করতে হয় এসব ঘাসের এক

একটির ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট ভিন্ন। সাধারণভাবে যেগুলো ভাল শিকড় গড়তে পারে, সেগুলো বংশবৃদ্ধির জন্য ছড়াতে পারে কম। আবার যেগুলোর শিকড় গড়ার ক্ষমতা কম তাদের বিস্তার লাভের ক্ষমতা বেশি। যেগুলো ছড়াতে কম পরে, ইকোসিষ্টেমে প্রতিযোগিতায় তাদের অসুবিধা হবার কথা ছিল। তারা কিন্তু অপেক্ষাকৃত পতিত জমিতে যেখানে অন্যরা শিকড় ঢুকাতে পারেনা সেখানেই দিব্যি বেড়ে উঠতে পারে। তাই কম ছড়াতে পারা সত্ত্বেও এই গুণের কারণে এরা একই তৃণভূমিতে দিব্যি টিকে থাকতে পারে। নানা ঘাসের প্রত্যেকটার জন্য গুণের সর্বোত্তম মিশ্রণটি ভিন্ন বলেই এমনটি হতে পারে।

সর্বোত্তম ব্যবস্থার তত্ত্ব নিয়ে সাম্প্রতিক কালে প্রাণিদের উপর প্রচুর গবেষণা হয়েছে। শরীরের আয়তনের সঙ্গে প্রজননের ব্যয়বহুলতার একটি বিপরীত সম্পর্কে রয়েছে। মনে রাখতে হবে যে কোন জীবের প্রজননের জন্য তাকে নানা দিক থেকে কিছু ব্যয় স্বীকার করতে হয়- যেমন শক্তিব্যয়। যারা বড় দেহ নিয়ে টিকতে পারে বেশি তাদের প্রজননের শক্তিব্যয় বেশি। এই দুইয়ের এরকম সম্পর্কের কারণ বড়দেহী প্রাণি প্রজননের উপযুক্ত হতে সময় নেয়। আবার যে সব হরমোন দেহায়তন নিয়ন্ত্রণ করে তাই আবার প্রজননের মত জীবন প্রক্রিয়াগুলোও নিয়ন্ত্রণ করে। বড় হবার জন্য শক্তিব্যয় করতে হলে প্রজননের সময় শক্তির টান পড়াটি স্বাভাবিক। এটিও নানা বিচিত্র প্রাণির সহঅবস্থানের সুযোগ বাড়ায়। এমনিতে হয়তো বড় প্রাণিরই টিকে থাকার কথা অন্য সবগুলোর বিলুপ্তির বিনিময়ে। কিন্তু যেহেতু তার প্রজনন সীমাবদ্ধ সেখানে অন্যরা সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে। এই দুই ক্ষমতার মিশ্রণ নানা প্রাণিতে নানা রকমের বলে আপেক্ষিক সুবিধার কিছু কিছু ভাগ তাদের প্রত্যেকটিই পেতে পারে। ঐ মিশ্রণগুলো নানা দিক থেকে আসে– প্রথম প্রজননের বয়সে, প্রজননের হারে, আয়ুষ্কালের ভিন্নতায় ইত্যাদি। তাই আকারে বড়দের মধ্যে ছোটদেরও স্থান হয়– কারণ তাদের অন্য সুবিধা থাকে।

দেহায়তন যেমন প্রজনন ব্যয়ের সঙ্গে মিশিয়ে সর্বোত্তম এক এক ধরনের ব্যবস্থায় অনেক বৈচিত্রের সুযোগ সৃষ্টি করে, প্রজনন হারকেও প্রজনন ব্যয়ের সঙ্গে মিশিয়ে তেমনটি হয়। এক সঙ্গে কতটা ডিম দেয়া পাখির জন্য সুবিধাজনক এ নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণায় নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। সাধারণত যেটি মনে করা হতো– সর্বোচ্চ যতগুলো বাচ্চার যত্ন এক সঙ্গে নিতে পারবে ততগুলো ডিমই পাখি দেবে। কিন্তু গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে তার চেয়ে কম ডিম দেয়াটাই নিয়ম। ঐ পূর্ণ সংখ্যক ডিম দিলে এর প্রজনন ব্যয় এত বেশি হয় যে নিজের টিকে থাকা ও ভবিষ্যৎ প্রজনন করতে পারার ক্ষমতার উপর তা বিরূপ প্রভাব

ফেলবে। প্রজননের যে একটি ব্যয় আছে তার কারণ প্রজনন প্রক্রিয়াটি প্রাণির জন্য রোগ, শিকার, দুর্ঘটনা ইত্যাদি থেকে বিপদের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয় পূরণ, রোগ প্রতিরোধ, সুস্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ কমিয়ে ফেলে।

প্রজনন হার ও প্রজনন ব্যয়ের বিপরীত সম্পর্ক ইত্যাদি আমরা বুঝতে পারছি নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষণের মাধ্যমে। প্রজনন হারে স্বাভাবিক ভিন্নতাগুলোর উপর ভিত্তি করে এ পরীক্ষা করা যায়। কিন্তু তার চেয়ে নিখুঁত হয় যদি পরীক্ষার খাতিরে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে কৃত্রিম ভাবে প্রজনন হার কমবেশি করা হয়, এবং পরবর্তীতে টিকে থাকার হার ও প্রজনন সম্ভাবনার উপর তার প্রভাব পরিমাপ করা যায়। এরকম পরীক্ষণের মাধ্যমেই উভয়ের মধ্যে বিপরীত সম্পর্কগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে। আর এখন বুঝা যাচ্ছে এ ধরনের সম্পর্কই সর্বোত্তম ব্যবস্থার (অপটিমাইজেশন) মাধ্যমে জীববৈচিত্রের সুযোগ করে দিচ্ছে।

বনে বৃক্ষবৈচিত্র: পরিবেশ ও প্রতিযোগিতার ফল

বনের মধ্যে অন্য গাছের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সফল হতে হলে একটি বৃক্ষপ্রজাতিকে স্থানীয় পরিবেশের ভাল সুযোগ নিয়ে টিকতে ও বাড়তে হবে। এ মানে ওখানে যে আলো, উত্তাপ, আর্দ্রতা, পুষ্টি ইত্যাদি পাওয়া যায় তার ভাল ব্যবহার করতে পারতে হবে। আর এই কাজটি একে করতে হবে প্রতিযোগী অন্যান্য গাছের তুলনায় আরো বেশি ভালভাবে। একাজে পরিবেশের সুযোগ নেবার প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু পরিবেশ কারো জন্য খুব ছিমছাম সরলভাবে আসেনা। যেমন গাছ নিজেই কিন্তু তার পরিবেশকে কিছুটা বদলিয়ে দেয়– নেহাৎ নির্লিপ্তভাবে পরিবেশকে শুধু গ্রহণই করেনা। একদিকে পরিবেশ গাছের আকৃতি, আয়তন ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে, অন্যদিকে গাছ নিজে ছায়া সৃষ্টি করে, নিজের অবয়ব বিস্তৃত করে স্থানীয় পরিবেশকে বদলায়। উভয় ক্ষেত্রে তাদের ক্রিয়ার একটি প্রতিক্রিয়া রয়েছে, যা আবার ফিরে আসে তার নিজের উপর। যেমন একটি গাছ ছায়া বিস্তার করে বলে ওখানে মাটিতে পড়ার পর তার নিজের এবং অন্যান্য গাছের অঙ্কুরিত বীজ বা চারার বাড়তে অসুবিধা ঘটতে পারে। ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা প্রতিযোগিতাকে যে রকম বিচিত্র সর্বোত্তম ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জীববৈচিত্রের সহায়ক হিসাবে দেখেছি, এই ক্ষেত্রে বরং তাকে বৈচিত্রের প্রতিকূল হিসাবে দেখছি। যে গাছ শুরুতে আলোর সুবিধা পেয়ে উঁচু হয়েছে, সে পরে আরো আলো পাবে এবং আরো উচুঁ হবে, অন্যদের অসুবিধা আরো বাড়বে।

এভাবে ক্রমেই বৈচিত্র হ্রাস পাবে। এর ফলেই যে কোন বনে প্রায়শই ধীরে ধীরে একই গাছের একক বনে পরিণত হবার প্রবণতা দেখা দেয়।

কিন্তু এর একটি উল্টো চিত্রও রয়েছে। গাছ যখন তার স্থানীয় পরিবেশকে বদলায় তখন সেখানে নানা রকমের কিছু ক্ষুদে পরিবেশ সৃষ্টি করে। যেমন নিজের গায়ে ও আশেপাশে নানা রকম উত্তাপবৈচিত্র, আলো-ছায়া ইত্যাদি সৃষ্টি করে। উদ্ভিদের নানা প্রজাতি আবার পরিবেশের দ্বারা নানা পরিমাণে ও নানা ভাবে প্রভাবিত হয়। যেমন বড় বৃক্ষকে প্রধানত নাইট্রোজেন পুষ্টির পরিমাণের উপরই নিজের বৃদ্ধির জন্য নির্ভর করতে হয়। এই নাইট্রোজেন পুষ্টির প্রাপ্তি তার বড় হবার উর্দ্ধ সীমা ঠিক করে দেয়। কিন্তু ছোট গাছ ও অন্যান্য উদ্ভিদের বড় হবার উর্দ্ধসীমা অন্যান্য নানা কিছুর দ্বারাও নির্ধারিত হয়, শুধু নাইট্রোজেন দ্বারা নয়। ফলে ঐ ক্ষুদে পরিবেশগুলোর মধ্যে অন্যান্য নানা গাছ তাদের আলাদা আলাদা ভূবন রচনা করতে পারে। শুধু ছোট গাছই নয় ঝোপঝাড়, লতা ইত্যাদি অনেকেরই সুযোগ হয় নানা ক্ষুদে পরিবেশের সৃষ্ট নানা ভূবনে। ভূবনবৈচিত্র যে কীভাবে প্রজাতি বৈচিত্রের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তা আমরা আগেই দেখেছি। কাজেই একটি গাছ কিন্তু পরিবেশের সঙ্গে তার বিক্রিয়ার দ্বারা নিজেই অধিক উদ্ভিদ বৈচিত্র সৃষ্টি করে চলেছে। এক্ষেত্রে প্রবণতাটি হলো বৈচিত্র ক্রমে আরো বৈচিত্রের সৃষ্টি করে। এভাবে বনের মধ্যে দুটি প্রবণতা এক সঙ্গে দেখছি। প্রতিযোগিতা কাজ করছে জীববৈচিত্রকে কমিয়ে ফেলতে, আর স্থানীয় ক্ষুদে পরিবেশ কাজ করছে এই বৈচিত্রকে বাড়িয়ে ফেলতে। বনের উদ্ভিদবৈচিত্র শেষ পর্যন্ত স্থির হচ্ছে এই উভয়ের পরস্পর বিরোধী প্রভাবের টানাটানির ফলশ্রুতি হিসাবে। আজকাল প্রচুর গবেষণা হচ্ছে বনের মধ্যে উদ্ভিদের তুলনামূলক প্রাচুর্যের বিষয়ে এবং তারই ফলে এখানকার উদ্ভিদবৈচিত্রের উপর এসব নানা প্রভাব সাম্প্রতিক কালে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

শিকার-শিকারি প্রতিযোগিতা

শিকার-শিকারির চিরন্তন প্রতিযোগিতাকে আমরা দু'ভাবে পাই– একটি হলো উদ্ভিদভোজিতা হিসাবে যেখানে শিকার মাত্রই উদ্ভিদ এবং শিকারি মাত্রই প্রাণি। অন্যটি হলো প্রাণিভোজিতা– যেখানে শিকার-শিকারির উভয়েই প্রাণি (খুবই ব্যতিক্রমি দু'একটি কীটভোজী উদ্ভিদ বাদ দিলে)। আরো এক ধরনের সম্পর্ককে একভাবে শিকার-শিকারির মত বলা যায়– সেটি হলো পরজীবিতা। এক্ষেত্রে এক জীব অন্য জীবের আশ্রিত হয়ে তার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে– যেমন

কৃমি, জীবাণু ইত্যাদি। অন্য দুটির সঙ্গে এর তফাৎ হলো পরজীবিরা তাদের আশ্রয়কে ধীরে ধীরে দুর্বল করলেও, সরচরাচর একেবারে মেরে ফেলেনা।

ইকোসিষ্টেমে উদ্ভিদভোজিতা অত্যন্ত ব্যাপক হলেও তার ফলে উদ্ভিদ জগতের সমারোহ ও বৈচিত্রে কোন ঘাটতি হয়নি। একদিকে উদ্ভিদভোজী প্রাণি অন্যদিকে তাদের খাদ্য উদ্ভিদের মধ্যে যে ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়া এর উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা আগেও প্রচুর হয়েছে, এখনো হচ্ছে। এ নিয়ে আগের ধ্যান ধারণাতে কিছুটা পরিবর্তনও আসছে। উদ্ভিদভোজিতা যে উদ্ভিদকে উজাড় করে দিতে পারেনা তার একটি বড় কারণ হলো উদ্ভিদভোজী প্রাণি নিজেরাও প্রায়শ তাদের শিকারি প্রাণিভোজীদের কারণে সংখ্যায় নিয়ন্ত্রিত থাকে। আর অন্য একটি কারণ হলো উদ্ভিদের নিজের মধ্যেই তার খাদকদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ বিবর্তনের ফলে গড়ে উঠেছে। আসলে এ ক্ষেত্রে উদ্ভিদ আর উদ্ভিদভোজীর আচরণ দুই পরাশক্তির মধ্যে অস্ত্র-প্রতিযোগিতার মত– এ পক্ষ অস্ত্র বাড়ায় তো, অন্য পক্ষ নিজের অস্ত্র আরো বাড়ায়। বিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভিদ নিজের মধ্যে এমন বিষ সৃষ্টি করে যা উদ্ভিদভোজীর পেটে গেলে সমস্যা সৃষ্টি হবে। এরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিবর্তন আবার উদ্ভিদভোজীর পাকস্থলীকে সেই বিষক্ষয়ের সুযোগ করে দেয়। তখন উদ্ভিদের দরকার হয়ে পরে আরো কড়া বিষ। এমনি ভাবে বাড়তে থাকে দু'পক্ষেরই বিবর্তন-প্রতিযোগিতা। ১৯৮০'র দশকে এসে অন্তহীন এই 'অস্ত্র প্রতিযোগিতার' তত্ত্বটি বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আরো সাম্প্রতিক গবেষণা দেখাচ্ছে যে বিবর্তন এক্ষেত্রে ততটা সরল রেখায় কাজ করে না। যে রাসায়নিক প্রতিরক্ষার উপর এ তত্ত্বে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বর্তমান জৈব রাসায়নিক সাক্ষ্যগুলো অতটা গুরুত্ব দিতে নারাজ। উদ্ভিদ আর উদ্ভিদভোজীর মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও যতটা সর্বব্যাপী মনে করা হচ্ছিল এটি ততটা নয়। পাখি যখন শস্যবীজ খায় তখন পাখির আর বীজের মধ্যে তেমন কোন বিক্রিয়া নাই। অন্যদিকে কিন্তু ভেড়া যখন তৃণভূমিতে চরে সেখানকার উদ্ভিদ প্যাটার্নের উপর তার যথেষ্ট প্রভাব থাকে। যেখানে চারণ ঘটে সেখানটা ঘাসে ঢাকা থাকে কারণ ঘাস খাওয়ার ফলে বাকি ঘাস আবার বাড়ে, যেখানে চারণ ঘটেনা সেখানটা ঢাকা থাকে ঝোপঝাড় লতা ও গাছপালায় কারণ এখানে ঘাসের চেয়ে শক্তিশালীরা নির্বিঘ্নে আসন গাড়ে।

উদ্ভিদের প্রতিরক্ষা গড়া সম্পর্কে সর্বাধুনিক তত্ত্বের মতে এটি নির্ভর করে উদ্ভিদটি দ্রুত বর্ধনশীল না ধীর বর্ধনশীল তার উপর। যেগুলো ধীরে বাড়ে তাদের প্রতিরক্ষা হয় একটু সেকেলে যান্ত্রিক ধরনের– প্রধানত পাতাকে পুরু রোঁয়া বা কাঁটাযুক্ত ও অনাকর্ষণীয় করে এটি ঘটে, যাতে উদ্ভিদভোজীর পক্ষে একে খাওয়া

সহজ না হয়। সাধারণত অনুর্বর জায়গায় এ ধরনের যে ধীর বর্ধনশীল উদ্ভিদগুলো জন্মে তাদের বিবর্তনজাত বৈশিষ্টগুলো এসেছে অনেক প্রাচীন কালে– তাই সেকেলে এই প্রতিরক্ষা। যে সব উদ্ভিদ দ্রুত বাড়ে সেখানে বিবর্তন আধুনিক। এখানে কীট পতঙ্গের উদ্ভিদভোজিতাটি গুরুত্বপূর্ণ, আর সেই রাসায়নিক অস্ত্র প্রতিযোগিতাটিও এখানেই দেখা যায়। কীট পতঙ্গের আক্রমণে উদ্ভিদে দ্রুত ক্ষত সৃষ্টি হলে এর প্রতিক্রিয়ায় তাদের রাসায়নিক বিষময়তাটি কার্যকর হয়। কীট পতঙ্গের বন্টন, কী ভাবে তা উদ্ভিদকে আক্রমণ করছে, ক্ষত করছে তার প্যাটার্নটিও বিষময়তা কার্যকর করায় অবদান রাখে।

প্রাণিভোজিতার মধ্যে শিকার-শিকারি পরিস্থিতিটি চক্রাকারে পরিবর্তিত হয়। শিকারের সংখ্যা বেড়ে গেলে খাদ্য সহজলভ্য হওয়াতে শিকারির সংখ্যাটি বাড়ে। কিন্তু শিকারি বেশি বেড়ে গেলে প্রয়োজনীয় শিকারের ঘাটতি ঘটে, ফলে কিছু পরে শিকারিও আবার কমে যায় ও তাদের তুলনায় শিকার বেশি হয়। এভাবে উত্থান-পতন চক্র চলতেই থাকে। ১৯৩০ এর দশক থেকে এই চক্রের তত্ত্বটি সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে আধুনিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে শিকারের সংখ্যা যথেষ্ট ভারি না হলে, এবং তারা শিকারির চেয়ে দ্রুততর গতিতে না বাড়লে এই চক্র স্থায়ী হবেনা। চক্র স্থায়ী হলেই শুধু শিকার-শিকারি সহঅবস্থানটি পাকাপোক্ত হয়। আজকাল শিকার-শিকারি সহঅবস্থানের প্রকৃতি বোঝার জন্য নানা ধরনের পরীক্ষণ চালানো যাচ্ছে। আর সেটি চালানো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বসত বিন্যাসে। একটি সাম্প্রতিক ছোট উদাহরণ নেয়া যাক। যেমন একেবারে শহরের মধ্যে কী হচ্ছে তা দেখার জন্য ইংল্যান্ডে রীডিং শহরে পরীক্ষা করা হয়েছে

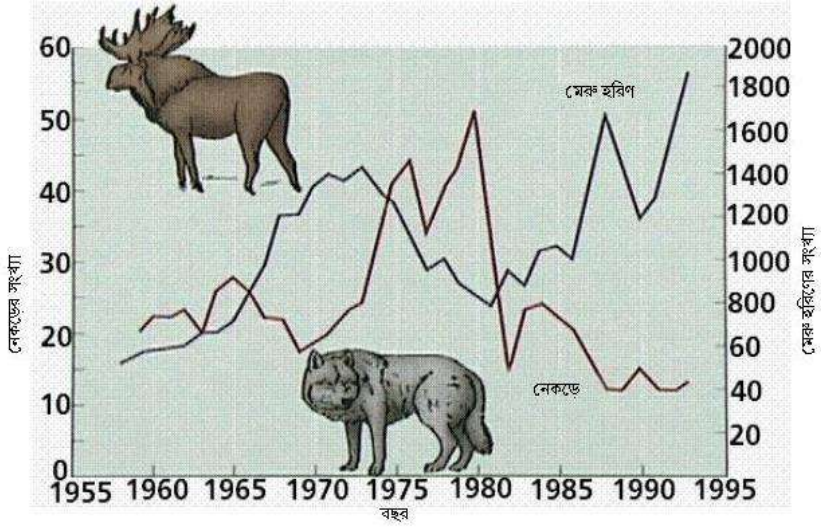

শিকার সংখ্যা ও শিকারি সংখ্যার পরস্পর সম্পর্ক

বিড়াল নিয়ে। ২০০টি বিড়ালের গায়ে জিপিএস সহ টেলিমেট্রি সরঞ্জাম লাগিয়ে দেখা গেছে এরা মাত্র এক বর্গ কিলোমিটার এলাকায় কী রকম ঘোরাফেরা করছে, সম্ভাব্য শিকারের উপর কী প্রভাব রাখছে। এ ধরনের পরীক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে গাণিতিক মডেলিংও ব্যাপারগুলো বুঝতে সাহায্য করছে। এরকম একটি মডেল দেখাচ্ছে বসত বিন্যাসের মধ্যে শিকার-শিকারি সহঅবস্থান এবং তার ফলে জীববৈচিত্র সহজতর হয় যদি সেই বিন্যাস যথেষ্ট জটিল হয়। এরকম জটিল বসতে শিকারগুলো সহজে একদিক থেকে অন্যদিকে চলে যেতে পারে, তাদের লুকাবার ও আশ্রয় নেবার জায়গাও বেশি থাকে। শিকারির চলাচল সুযোগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিকারেরও সে সুযোগ থাকলে সহঅবস্থানের পরিস্থিতিটি সৃষ্টি হয়– শিকারগুলো এক তরফা মারা পড়েনা।

একটি জিনিস এখন স্পষ্ট। জীব প্রজাতিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতাকে আপাত-দৃষ্টিতে যত সরল মনে হয় আসলে এরা তা নয়। এর সারল্যের অভাবটাই প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও জীব বৈচিত্রকে টিকিয়ে রেখেছে, এমনকি বাড়িয়েও চলেছে।

সহযোগিতার নানা রূপ

প্রতিযোগিতার ফলে জীববৈচিত্র কেন বাড়বে তার ব্যাখ্যাটি জটিল হতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন প্রজাতি একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতার মধ্যে থাকলে সেক্ষেত্রে ইকোসিস্টেমে জীববৈচিত্র যে প্রশ্রয় পাবে সে তো সাধারণ বুদ্ধিতেই ধরা পড়ে। তবে সেখানেও সম্পর্কগুলো বিশ্লেষণের প্রশ্ন রয়েছে, কারণ সহযোগিতার ফলে প্রাপ্তি যেমন রয়েছে তার কিছু ব্যয়ও রয়েছে। সহযোগী দুই পক্ষের জন্যই যদি ব্যয়ের চেয়ে প্রাপ্তি বেশি না হয় তা হলে সহযোগিতাটি দানা বাঁধা কঠিন।

নানা জীবের মধ্যে কতগুলো সহযোগিতা মামুলি ধরনের– এতে কারো জীবন মরণ নির্ভর করেনা। তবুও এই সহযোগিতা তাদেরকে একত্রে রাখে। মহিষ মাঠে চরছে আর কিছু পাখি সারাক্ষণ তার গায়ে গায়ে আছে, তার গা থেকে পোকা মাকড় বেছে বেছে খাচ্ছে। এখানেই একটি মামুলি সহযোগিতা দেখতে পাচ্ছি– পাখি খাবার পাচ্ছে, মহিষ তার গা পরিষ্কার রাখতে পারছে। আফ্রিকার মৌ-সন্ধানী পাখি মৌচাকের সন্ধান পায় কিন্তু মৌমাছির পাহারার মধ্যে সেখান থেকে খেতে পারেনা। কিন্তু মৌচাকের সন্ধান পেলে এরা কিচির মিচির করে কোলাহল তুলে মধু খাওয়া প্রাণি ব্যাজারকে জানিয়ে দেয়। ব্যাজার মৌমাছি তাড়িয়ে মধু খায়, মৌমাছির লার্ভাও খায়। পাখিও তার ভাগ পায়। তবে অনেকগুলো সহযোগিতা ও পরস্পর নির্ভরশীলতা মামুলি নয়, খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পরাগায়নের ব্যাপারটিই ধরা যাক– মৌমাছি, বোলতা, পাখি তাদের খাদ্যের জন্য ফুলের মৌ ও পরাগের উপর নির্ভর করে। আর সেই সুবাদে ফুলের পক্ষে সম্ভব হয় উদ্ভিদ প্রজননে তার কেন্দ্রীয় ভূমিকাটি পালন করা, পরাগ সংযোগের মাধ্যমে। উভয় পক্ষ এই সহযোগিতার জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠেছে– যেমন ডুমুরের ফুল এবং ডুমুরের বোলতা উভয়ে পরস্পরের ঠিক উপযুক্ত হয়ে অদ্ভূত আকৃতি পেয়েছে। একই ভাবে অন্যান্য নানা সহযোগিতার ক্ষেত্রেও পরস্পরের জন্য এতে যথেষ্ট প্রাপ্তি সৃষ্টির চেষ্টা থাকে। কোন কোন একাসিয়া গাছ পতঙ্গের উদ্ভিদভোজিতার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিজের গায়ে পিঁপড়া কলোনি তৈরির সুবিধা করে দয়, গায়ে টসটসে রসালো কাঁটার মত অংশ তৈরি করে পিঁপড়ার ভোজে লাগার জন্য। বিনিময়ে পিঁপড়া ঐ উদ্ভিদভোজি পতঙ্গকে আক্রমণ করে ঐ গাছ থেকে দূরে রাখে।

পিঁপড়া ক্ষুদ্র এফিড কীটকে নিজের কলোনিতে নিয়ে আশ্রয় দেয়। এফিড ফাঙ্গাস গজিয়ে পিঁপড়াকে খাদ্য দেয়। উইয়ের পেটে থাকা ব্যাকটেরিয়া যখন উইয়ের খাওয়া কাঠ বা অন্যান্য সেলুলোজ হজম করতে দেয় তখন ওটি বাঁচা মরার ক্ষেত্রে আরো অপরিহার্য সহযোগিতা। কারণ উই নিজে তার ঐ খাবার হজম করতে পারেনা, আর ঐ ব্যাকটেরিয়া উইএর পেটে ছাড়া বাঁচেনা।

পিঁপড়া ও এফিডের পারস্পরিকতা
(আশ্রিত এফিড পিঁপড়ার জন্য ফাঙ্গাস চাষ করে)

সহযোগিতার বিষয়টিতে গবেষণায় নূতন নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে। কারণ এক একটি ক্ষেত্রে সহযোগিতার অপরিহার্যতার স্বরূপ এক এক রকম হতে পারে। যেমন প্রত্যেক পক্ষের উপকার সমান নাও হতে পারে, সেক্ষেত্রে ব্যাপারটি মধ্যে অপ্রতিসাম্যটি পরিমাপ ও বিশ্লেষণ করার রয়েছে। অর্থাৎ সহযোগিতাটি কতটা একমুখি, কেন একমুখি তা বুঝা দরকার। এর একটি উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ

করা যায় যে উঁচু বৃক্ষের উপর যে এপিফাইট ঝোপ বা বায়ুজীবি উদ্ভিদ আশ্রয় পায় তাতে বৃক্ষের কোন লাভ স্পষ্টত দেখা যায়না। দুই পক্ষের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সহযোগিতা থেকে প্রাপ্তি ও ব্যয়টি হিসেব করার প্রয়োজন রয়েছে। এসব গবেষণা থেকে যে তত্ত্ব দেয়া সম্ভব হচ্ছে, এর থেকেই বুঝা যাবে জীববৈচিত্রের উপর এরকম সহযোগিতার প্রভাবগুলো।

গবেষণার একটি উদাহরণ: পিঁপড়া-প্রজাপতি সহযোগিতা

বিশেষ ধরনের কিছু কিছু পিঁপড়া বিশেষ ধরনের কিছু প্রজাপতির শূককীট (লার্ভা) ও মূককীটকে (পিউপা) যত্নসহকারে লালন পালন করে। এতে পিঁপড়ার কী লাভ আর প্রজাপতির কীটেরই বা কী লাভ ঠিক বুঝা যাচ্ছিলনা। গবেষণাটি এই নিয়েই– প্রধানত প্রত্যেক পক্ষের জন্য এতে ব্যয় কী আর প্রাপ্তি কী তা নির্ণয় করা। ঐ প্রজাপতি সাধারণত ডিম দেয় বিশেষ বিশেষ আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের

পিঁপড়া ও প্রজাপতির (শূককীট ও মূককীট) পারস্পরিক সহযোগিতা

উপর, যাতে করে ডিম থেকে বেরিয়ে এসে শূককীট ঐ গাছের পাতা খেয়ে বড় হতে পারে। গবেষকরা লাবোরেটরীতে এবং মাঠে ঐ আশ্রয়দাতা গাছগুলোকে গজিয়ে তার মধ্যে ঐ প্রজাপতির কীটকে বাড়তে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। উদ্দেশ্য হলো নিয়ন্ত্রিত ভাবে তাদের উপর পিঁপড়ার আচরণগুলো লক্ষ্য করা।

ঐ উদ্ভিদের কাছে স্থাপন করা হয়েছে রাণি, শ্রমিক ইত্যাদি সব সমেত বাক্সের মধ্যে পিঁপড়ার পুরো কলোনি। সেখান থেকে ঐ কীটদের কাছে পিঁপড়াকে যেতে দেয়া বা না দেয়ার জন্য কিছু উপযুক্ত প্রতিবন্ধক রাখা হয়েছে। দেখার চেষ্টা করা হয়েছে ঐ কীটদের কাছে যেতে দিলে পিঁপড়া তাদের কোন উপকার করে কিনা। যেমন পরজীবি বা শিকারির হাত থেকে ঐ কীটদের রক্ষা করার ব্যাপারে পিঁপড়ার কোন ভূমিকা আছে কিনা। এ পরীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রতিবন্ধক দিয়ে পিঁপড়াকে কীট থেকে দূরে রাখলে, পতঙ্গ ইত্যাদির শিকার হয়ে কীটের সংখ্যা বেশ কমে যায়। আরো কিছু জিনিস লক্ষ্য করা হলো। যেমন দেখা গেল যে পিঁপড়াকে কাছে যেতে দিলে ঐ শূককীটগুলোর যত দ্রুত বিকাশ ঘটে, যেতে না দিলে সে রকম দ্রুত ঘটেনা। পিঁপড়া থাকলে ২৩ দিনে শূককীট মূককীটে পরিণত হয়। আর পিঁপড়া না থাকলে এটি হতে ২৯ দিন সময় লাগে। এভাবে দ্রুত অপেক্ষাকৃত নিরাপদে আবৃত মূককীটে পরিণত হলে শূককীটের আক্রান্ত হয়ে মারা পড়ার সম্ভাবনাও কমে যায়। এভাবে কীটের দিক থেকে এই সহযোগিতার উপকারগুলো স্পষ্ট হলো। কিন্তু তাকে কি এর জন্য কোন ব্যয় স্বীকার করতে হয়না? হয় বৈকি। দেখা গেছে যে পিঁপড়ার সহায়তায় এভাবে দ্রুত মূককীটে পরিণত হবার একটি ফলশ্রুতি হলো পরে যখন পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি বের হয় তখন তা আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট হয়। স্ত্রী প্রজাপতির ক্ষেত্রে এই পূর্ণাঙ্গ আয়তনের সঙ্গে তার প্রজনন ক্ষমতার কিছুটা সম্পর্ক আছে– আয়তন ছোট হলে প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়। পুরুষ প্রজাপতির ক্ষেত্রে আয়তনে ছোট হলে যৌন মিলনের সুযোগ কমে গিয়ে ব্যাপারটি একই ঘটে। অর্থাৎ কিনা পিঁপড়ার দ্বারা লালন পালনের সুযোগ নিতে গিয়ে প্রজাপতিকে কিছুটা ব্যয় স্বীকার করতে হচ্ছে তার প্রজনন ক্ষমতার ঘাটতি দিয়ে।

এ তো গেল প্রজাপতির কীটের দিক থেকে প্রাপ্তি আর ব্যয়। কিন্তু এই সহযোগিতার মধ্যে পিঁপড়ার জন্য কী আছে? এই দিকটি খুব স্পষ্ট নয়, এর পরীক্ষণও অপেক্ষাকৃত কঠিন। তা ছাড়া পিঁপড়া কী ভাবে শূককীটের বিকাশে প্রভাব রাখে তাও বুঝা দরকার। গভীর পর্যবেক্ষণে দেখা গেল পিঁপড়া কীটের গা লেহন করে, তার দেহের বিশেষ বিশেষ নিঃসরণ সে গ্রহণ করে। ব্যাপারটি স্পষ্টত পিঁপড়ার জন্য উপকারী কারণ এটি করতে গিয়ে সে অনেক কষ্ট স্বীকার

করে নিজের বাসাকে কীটের অবস্থান পর্যন্ত সম্প্রসারণ করে নিয়ে যায়। কীটের দেহের ঐ নিঃসরণগুলোর জৈব রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে এতে এমন কিছু এমাইনো এসিড রয়েছে যেগুলো পিঁপড়ার পুষ্টি ও প্রজনন ক্ষমতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন তৈরিতে জরুরী। সরাসরি পরীক্ষায়ও এটি প্রমাণিত হয়েছে। যে সব কলোনির পিঁপড়ার এভাবে কীটের গা লেহনের সুযোগ রয়েছে সেই সব কলোনির বিকাশ ও তাতে প্রজনন হার তুলনামূলক ভাবে বর্ধিষ্ণু হতে দেখা গেছে। কীটগুলো ছোট হলেও তাদের নিঃসরণ খেয়ে পিঁপড়ার পরিবর্তনটি নেহাৎ তুচ্ছ নয়। যে সব পিঁপড়াকে কীটের আছে যেতে দেয়া হয়না তাদের চেয়ে যেগুলোকে যেতে দেয়া হয় তাদের ওজন অনেক বেড়ে যায়। কীটের কাছে যেতে দেয়ার আগে পিঁপড়ার শুষ্ক ওজন এবং ফিরে আসার পর তার শুষ্ক ওজন নিয়ে দেখা গেছে এক একটি পিঁপড়া এভাবে দৈনিক ৪০০ মিলিগ্রাম পুষ্টি-ওজন কীট থেকে নিজের কাছে স্থানান্তর করে। একারণেই শূককীট দ্রুত মূককীটে পরিণত হয়। তার সার্বিক পুষ্টিগত অভাব অবশ্য তেমন ঘটেনা, কারণ শূককীট তার খাদ্য গ্রহণে পরিবর্তন এনে ঐ ক্ষতি পূরণ করতে পারে। একবার নিশ্চল মূককীটে পরিণত হয়ে গেলে অবশ্য এরকম ক্ষতিপূরণ আর সম্ভব হয়না। অথচ পিঁপড়া শূককীটের মত মূককীটের থেকেও নিঃসরণ গ্রহণ করে। ফলে পিঁপড়ার যত্নের মধ্যে থাকা মূককীটগুলো ৫ দিনে প্রায় ২৫% ওজন হারায়। এরই ফলশ্রুতিতে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি আকারে ছোট ও কম প্রজনন ক্ষমতার অধিকারী হয়।

প্রজাপতির ক্ষেত্রে উপকারটি অবিমিশ্র না হলেও পিঁপড়ার ক্ষেত্রে শুধু উপকারই দেখা যাচ্ছে। তবে তাকেও এর জন্য একটি ব্যয় স্বীকার করতে হয় বৈকি। তা হলো তার পরিশ্রম ও শক্তি ব্যয়– ঐ কীটের কাছে যাওয়া, তাদেরকে যত্ন করা, রক্ষা করা, তাদের গা লেহন করা ইত্যাদির জন্য।

এভাবে সারা জীবজগতে রচিত হয়েছে অসংখ্য ছোট বড় সহযোগিতার বন্ধন, জীববৈচিত্র যার সুযোগ করে দিয়েছে, আবার যা জীববৈচিত্রকে বাড়িয়েছে। জীব বৈচিত্র হ্রাস পেলে, সহযোগিতার বন্ধনগুলো একে একে ভেঙ্গে গেলে, জীব-জগতের দীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাই ভেঙ্গে পড়বে এবং কার্যত সবাই বিপর্যস্ত হবে।

জীবসমাজে ভারসাম্য

প্রাথমিক উৎপাদনের হারটি গুরুত্বপূর্ণ

ইকোসিষ্টেমে নানা রকম প্রজাতি একটি জীবসমাজে সহঅবস্থান করে। ওখানকার সম্পদগুলোর উপরেই তাদের সবাইকে নির্ভর করতে হয়। জীবসমাজের দিক থেকে তাদের বাঁচার সকল উপাদান প্রাথমিক ভাবে আসতে হয় অজৈব জগৎ থেকে। সেগুলোই বিশেষ প্রক্রিয়ায় জৈব জগতে আত্মীকৃত হয়, এক জীব থেকে অন্য জীবে যায়, এবং পরে আবার অজৈব জগতে ফেরৎ যায়। এভাবে চক্রাকারে এগুলো আবর্তিত হয়। এর মধ্যে মূল প্রক্রিয়াটি হলো সালোক সংশ্লেষণ– যার মাধ্যমে সূর্যের আলোর শক্তি বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও মাটির পানি একত্র হয়ে মূল কার্বোহাইড্রেট খাদ্য তৈরি হয়। সর্বত্র সালোক সংশ্লেষণকারী উদ্ভিদ জাতীয় ছোট বড় জীবই এই প্রাথমিক উৎপাদনের জন্য দায়ী। এটিই পরে তাদেরকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণের মাধ্যমে কোন কোন প্রাণি পায়। এই প্রাণিদের খাদক অন্য প্রাণিও পরোক্ষ ভাবে তা পায়। শেষ পর্যন্ত এই খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে মূল প্রাথমিক উৎপাদনই সবার কাছে যায়। কাজেই বলতে গেলে প্রাথমিক উৎপাদক– উদ্ভিদ-প্ল্যাংকটন, উদ্ভিদ এরাই একমাত্র উৎপাদক, বাকি সবাই ভোক্তা। সূর্যের আলো শোষণের মাধ্যমে করতে হয় বলে এই উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত স্থানের আয়তনটি গুরুত্বপূর্ণ– কতখানি জায়গা জুড়ে সূর্যের আলো পড়তে পারছে তার কারণে। প্রাথমিক উৎপাদকরা উৎপাদন করার জন্য নিজেরা কিছু শক্তি ব্যয় করে। ঐ ব্যয় করা শক্তিটুকু বাদ

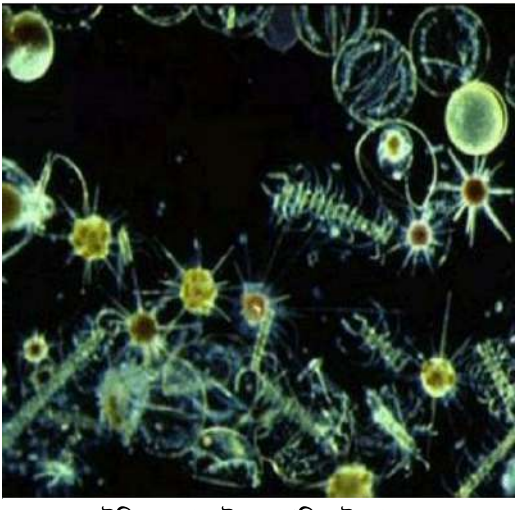

উদ্ভিদ প-্যাংকটনঃ প্রাথমিক উৎপাদক

দিয়ে সারা পৃথিবীর মোট প্রাথমিক উৎপাদনের উপর গড় নিলে বছরে প্রতি বর্গ মিটার স্থানে ৪৪০ গ্রাম জৈব বস্তু এর মাধ্যমে তৈরি হয়।

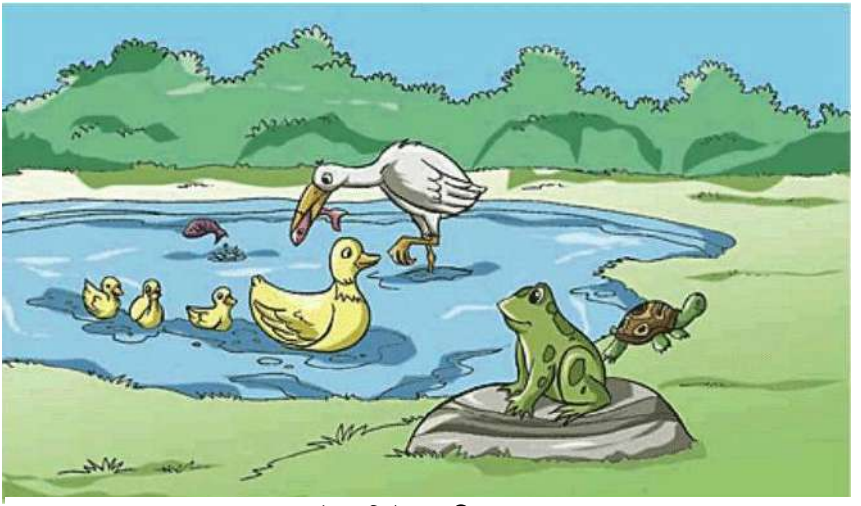

ইকোসিষ্টেমের জীবসমাজ

অবশ্য দুনিয়ার সব ধরনের ইকোসিষ্টেমে প্রাথমিক উৎপাদন একই হারে হয়না। কোন কোন পরিবেশ এই কাজে খুব উর্বর, আবার কোন কোন পরিবেশ তুলনামূলকভাবে নিষ্ফলা। স্বাভাবিক ভাবে উর্বর জায়গাগুলোতেই অধিক জীব সমারোহ দেখা দেবে কারণ তাদেরকে পোষণ করার মত যথেষ্ট প্রাথমিক উৎপাদন সেখানে রয়েছে। সব জীবের বেঁচে থাকার জন্য শক্তি প্রয়োজন যার উৎস তারা পায় খাদ্য হিসাবে অন্য জীব থেকে। শুধু প্রাথমিক উৎপাদকরাই তাদের উৎপাদনে সেই শক্তি সূর্য থেকে আহরণ করে। এই উৎপাদনের পরিমাণ আমরা শক্তির একক কেলোরির হিসাবে দেখতে পারি। প্রাথমিক উৎপাদনের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি দেখা যায় রেইন ফরেষ্ট বা বাদল বনে, সমুদ্রের খাড়িতে ও কোন কোন সমৃদ্ধ জলাভূমিতে। এরকম সব চেয়ে উৎপাদনশীল অঞ্চলে বছরে প্রতিবর্গ মিটারে ৯০০০ কিলোকেলোরি প্রাথমিক উৎপাদন হয়। উৎপাদিত বস্তুর পরিমাণকে এভাবে তার শক্তিমানের হিসাবেও প্রকাশ করা যায়। প্রাথমিক উৎপাদনে এর পরে পরেই স্থান পায় নাতিশীতোষ্ণ বন (৫,৬০০ কিলোকেলোরি) এবং পাইন জাতীয় বন (৩,৫০০ কিলোকেলোরি)। তৃণভূমির স্থান আসে তার পরে– বিশেষ করে আফ্রিকার সাভানা তৃণভূমি (৩,২০০ কিলোকেলোরি)। কৃষি জমিকে আমরা খুব উৎপাদনশীল মনে করি এবং ঝোপ-জংলাকে অনুৎপাদনশীল মনে করি। হয়তো শুধু মানুষের স্বার্থের কথা বিবেচনা করলে কথাটি ঠিক। কিন্তু পুরো জীবসমাজকে বিবেচনায় আনলে উৎপাদনশীলতায় কৃষি জমির স্থান বন

বাদাড় এমনকি সমৃদ্ধ তৃণভূমিরও নিচে। এর প্রাথমিক উৎপাদন ঘনত্ব বছরে প্রতি বর্গমিটারে মাত্র ৩০০০ কিলোকেলোরি। অবশ্য নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির স্থান কৃষি জমির নিচে (২,২০০ কিলোকেলোরি)। খোলা উন্মুক্ত সমুদ্রের অবস্থা আরো খারাপ (মাত্র ১০০০ কিলোকেলোরি)। আর মরুভূমি উৎপাদন তালিকায় সবার নিচে (২০০ কিলোকেলোরি)।

জীব জগতে সম্পদ চক্র, শক্তি প্রবাহ

জীবের জন্য অজৈব যে সম্পদগুলো পরিবেশে রয়েছে সেগুলো চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে, জীবের কাজে লাগছে, আবার প্রকৃতিতে ফিরে যাচ্ছে, আবার জীবের কাজে আসছে। এভাবে রয়েছে কার্বন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র, পানি চক্র ইত্যাদি। ফরফরাস চক্র, সালফার চক্র এসবও রয়েছে। কার্বন চক্রের কথাই ধরা যাক– জীবের সকল জৈব বস্তুর জন্যই যেটি অপরিহার্য। বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্ভিদের দেহে এবং তার মাধ্যমে প্রাণির মধ্যে আসছে। তাদের নিশ্বাসে কিছু আবার বায়ুমণ্ডলে ফেরৎ যাচ্ছে। জীব মারা গেলে তাদের মৃতদেহের মাধ্যমে বাকি কার্বন মাটিতে বা বর্জ্যে যাচ্ছে। সেখান থেকে আবার জীবাণুর কাজে পচনের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে যাচ্ছে। দীর্ঘ মেয়াদে দেখলে জীবের মরদেহ ভূ-অভ্যন্তরের গভীরে কোটি কোটি বছরে ফসিল জ্বালানি তৈরি হয়েছে। যখন তা আমরা পুড়ি তখনো কার্বন বায়ুমণ্ডলে ফেরৎ যাচ্ছে। ভূত্বকের নড়াচড়া বা প্লেইট টেকটোনিকের মাধ্যমে মাটির উপরের কার্বন ভূ-অভ্যন্তরে গিয়ে গলিত লাভার সঙ্গে মিশলে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে আবার বাতাসে ফিরে আসছে। এভাবে কার্বন পরিবেশে থেকে যাচ্ছে– বিভিন্ন পৃথক চক্রাকারে বার বার ফিরে এসে।

জটিলতর খাদ্য জাল (জলে-স্থলে-আকাশে)

জীবদেহ যে প্রোটিনে গড়া তার অপরিহার্য উপাদান নাইট্রোজেন। সেটিও চক্রাকারে জীবদেহে ফিরে আসছে বার বার। বাতাসের নাইট্রোজেন বিশেষ

ব্যাকটেরিয়ার কাজের মাধ্যমে মাটিতে ও উদ্ভিদে ফিরে আসে, যাকে বলা হয় নাইট্রোজেন ফিক্সেশন। বৃষ্টির মাধ্যমেও নাইট্রোজেন যৌগ মাটিতে আসে। উদ্ভিদ থেকে প্রাণি নাইট্রোজেন পায়, জীবদেহ থেকে বর্জ্যে গেলে সেখান থেকে জীবাণুর কাজে আবার বাতাসে ফেরৎ যায়। স্পষ্টত এসব চক্রকে বজায় রাখার জন্য জীববৈচিত্রের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। কোন চক্র তার কোন অংশে ব্যাহত হলে পুরো জীবসমাজই বিপর্যস্ত হয়। জীবসমাজের নানা জীবের মধ্য দিয়ে ঐ প্রাথমিক উৎপাদনে সৃষ্ট শক্তি প্রচারিত হয়– খাদ্য শৃঙ্খলের রূপে। কিন্তু একে ঠিক শৃঙ্খলও বলা যায়না, বলা উচিত খাদ্য জাল। কারণ এটি একটি শৃঙ্খল বা শেকলের মত সরল নয়। একটি জীব যদি শুধু সব সময় অন্য একটি জীবই খেত, আর নিজে শুধু অন্য একটি জীবের খাদ্য হতো তা হলে ব্যাপারটি শেকলের মত হতো। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক প্রাণি একাধিক জীব খায় এবং নিজেও একাধিক জীবের খাদ্য হয়, তাই ব্যাপারটি একটি জটিল জালের আকার ধারণ করে। তাছাড়া পুরো ব্যবস্থাটিকে একটি শক্তি-পিরামিডের আকারেও দেখা যায়। এই পিরামিডের তলার ভুমিটি হলো বড়, এখানেই ঘটছে সব প্রাথমিক উৎপাদন। অন্য জীব যারা পিরামিডে সর্ব নিম্নের জীবদের খায় তাদের স্থান পিরামিডে এর একটু উপরের স্তরে। এভাবে প্রাথমিক উৎপাদিত সব শক্তি তারা পায়না, কিছু শক্তির অপচয় হয়। ব্যবহারযোগ্য শক্তি অবশ্য এখানে কমে যায় বলে খাদ্য পিরামিডটি এই উপরের স্তরে কিছু সংকুচিত হয়ে আসে। তারপর আরো উপরের স্তরে আবারো শক্তির অপচয় হয় বলে ব্যবহারযোগ্য শক্তি আরো সংকুচিত হয়। দেখা যায় যে এভাবে স্তরের সংখ্যা যত বেশি হবে প্রত্যেকবার অপচয়ের ফলে পিরামিডের শীর্ষ খাদকের জন্য শক্তি মজুদ থাকবে তত কম। একই কারণে উপরের স্তরগুলোতে জীব প্রজাতির সদস্য সংখ্যা সাধারণত ক্রমাগত কমে যায়। শীর্ষ খাদকের সংখ্যা তাই হয় খুবই কম। তাদের বিলুপ্তির সম্ভাবনাও এ কারণে বেশি। অথচ কী-ষ্টোন প্রজাতি হিসাবে এদের অনেকে পুরো জীবসমাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শক্তি-পিরামিড থেকে একটি স্তর সরিয়ে ফেল্‌লে কী হয়

খাদ্য জালের অর্থাৎ শক্তি-পিরামিডের যে কোন অংশ থেকে একটি স্তর যদি বিলুপ্ত হয় তা হলে কী হতে পারে? সাম্প্রতিক গবেষণা এ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করছে। এটি বেশ খানিকটা নির্ভর করে খাদ্যজাল কত জটিল তার উপর। দেখা গেছে খাদ্য জাল যদি যথেষ্ট জটিল হয় তা হলে নিচের কোন স্তর বিলুপ্ত হলে ঐ জীবসমাজের অন্যান্য জীবের উপর এর তেমন প্রভাব পড়েনা। কিন্তু উপরের স্তর, বিশেষ করে কোন কী-ষ্টোন প্রজাতি সরালে পুরো পিরামিডেই

ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, অনেকে বিপর্যস্ত হয়। অধিকাংশ বড় বড় জীবসমাজে খাদ্য জাল জটিল বলে, এমনটিই ঘটে বেশি। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। প্রাথমিক উৎপাদক হিসাবে বনভূমিতে চেষ্টনাট বৃক্ষকে পিরামিডের ভূমির জীব মনে করা যায়। পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রে চেষ্টনাট ব্লাইট রোগে এই গাছ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এর ফলশ্রুতি দেখতে গিয়ে বনের প্রজাপতিগুলোর দিকে তাকানো হলো। প্রজাপতির ৭টি প্রজাতি চেষ্টনাটের উপর একান্তভাবে নির্ভর করতো। চেষ্টনাট ধ্বংস হওয়ার ফলে এই প্রজাপতিগুলো বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আরো ৪৯ রকমের প্রজাপতি প্রজাতি চেষ্টনাটের উপর কিছুটা নির্ভর করলেও তারা বিকল্প খাদ্য খুঁজে নিতে পেরেছে– তাদের সংখ্যায় তেমন কোন ঘাটতি ঘটেনি। কিছু শিকারি পতঙ্গ বিলুপ্ত ও টিকে থাকা এই মোট ৫৬ রকমের প্রজাপতি খেয়ে বাঁচতো– তাদের সংখ্যায়ও কোন তারতম্য হয়নি। অর্থাৎ চেষ্টনাটের স্থানীয় বিলুপ্তির ফলে সাধারণভাবে ঐ জীবসমাজে তেমন কোন প্রভাব পড়েনি। অনুরূপ জটিল খাদ্যজালের আর একটি উদাহরণ খুঁজে পাই উত্তর আমেরিকার মরু তৃণ ভূমিতে। ছোট ছোট প্রাণিরই প্রাধান্য যেখানে– যার মধ্যে ক্যাঙ্গারু ইঁদুর হলো কী-ষ্টোন প্রজাতি। ক্যাঙ্গারু ইঁদুরের প্রভাব এ তৃণভূমিতে খুবই বেশি– এরা মাটি খুঁড়ে উল্টে রাখে, তৃণের বীজ খেয়ে ফেলে। নানা ভাবে এরা অন্যান্য ইঁদুরের সংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। এরা বিলুপ্ত হবার পর দেখা গেছে যে অঞ্চলটি অপেক্ষাকৃত লম্বা নানা রকম ঘাসে ভরে গেছে এবং এতে বহু রকমের ক্ষতিকর ইঁদুরের প্রাচুর্য ঘটেছে। পিরামিডের উপরে থাকা অল্প সংখ্যক এই কী-ষ্টোন প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়াতে ওখানকার পুরো জীবসমাজটিই বদলে গেছে।

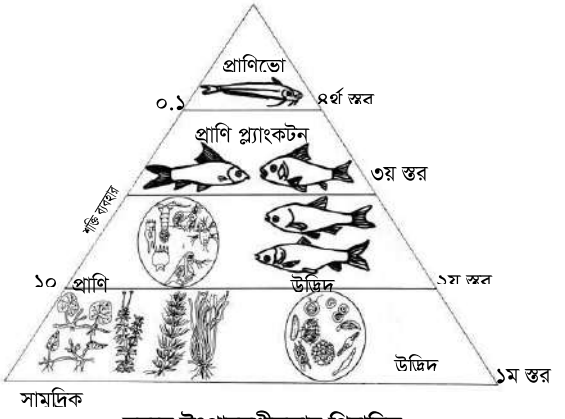

সমুদ্রে উৎপাদনশীলতার পিরামিড

খাদ্য জাল যদি সরল হয় তখন কিন্তু ঘটে এর ঠিক উলটোটা। এক্ষেত্রে নিচের স্তর বিলুপ্ত হলে প্রভাব খুব বড় হয়, উপরের স্তর বিলুপ্ত হলে তা হয়না। এধরনের সরল খাদ্য জালে বিশেষ দু'এক ধরণের খাদ্যের উপরেই এক একটি জীব নির্ভর করে। যেমন অষ্ট্রেলিয়ায় এ ধরনের জীবসমাজে কোয়ালা নির্ভর করে শুধু

ইউক্যালিপটাসের উপর। ইউক্যালিপটাস প্রাথমিক উৎপাদক। এখানে ইউক্যালিপটাস বিপন্ন হলে কোয়ালা বিপন্ন হয়, এর উপরের স্তরগুলোও বিপন্ন হয়। শীর্ষ খাদক খুব বিশিষ্ট কেউ নাই, উপরের দিকের প্রাণির বিলুপ্তি তাই প্রভাব রাখে কম।

স্থিতিশীলতার আধুনিক ধারণা

জীবসমাজে নানা পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু পরিবর্তন সাধারণত একটি স্থিতিশীলতার মধ্যে থাকে, সবকিছু একটি ভারসাম্যে থাকে। স্থিতিশীলতার অভাব ঘটলেই বড় ধরনের বিপর্যয়ের সম্ভাবনা থাকে। তবে ভারসাম্যের ধারণাটি সাম্প্রতিককালে অনেক খানি বদলে গেছে আধুনিক গবেষণার ফলে। ভারসাম্যের একটি প্রচলিত ধারণা ১৯২০ এর দশক থেকে চালু হয়ে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত যথেষ্ট প্রভাব রেখেছে। এর একটি ভাল উদাহরণ হলো বনের মধ্যে উদ্ভিদ জগতের ভারসাম্য। নূতন কোন বন যখন শুরু হয় তখন উদ্ভিদের বীজ, স্পোর ইত্যাদি এসে কিছু আগন্তক প্রজাতি প্রথম তার গোড়া পত্তন করে। ঐ বীজের উপ্তি কাল থেকেই নানা উদ্ভিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দেয় ওখানকার সীমিত রসদের জন্য। পরিবেশের ক্রিয়ায় কোন কোন উদ্ভিদ সেখানে কলোনি করে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বটে, কিন্তু ওরাই আবার সেই পরিবেশে পরিবর্তন ঘটায়। এ পরিবর্তনের ফলে নূতন নূতন আগন্তক উদ্ভিদের সুযোগ ঘটে। এ ভাবে দফায় দফায় কলোনি স্থাপনের পর অবশেষে বনে স্থিতি আসে। এতে পুরানো একটি প্রজাতি হয়তো প্রাধান্য লাভ করে যাকে বলা হয় ক্লাইম্যাক্স প্রজাতি অর্থাৎ তুঙ্গে উঠা প্রজাতি। পালাবদলের মাধ্যমে এভাবে বন একটি নির্দিষ্ট বিকাশের পথ অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত স্থিতি অবস্থায় আসে।

আধুনিকতর মত হলো পালাবদলটি সারাটি বনে একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ায় হয়না, বরং প্রত্যেক প্রজাতি নিজের মত নিজের কাজ করে যায় যার ফলে জীবসমাজটি ক্রমেই পরিবর্তিত হয়ে চলে। এতে প্রজাতি সব সময় আসছে, বাড়ছে, কমছে, বিলুপ্ত হচ্ছে– ফলে পালাবদলটি বহুমুখি। আগের তত্ত্বে যেমনটি মনে করা হতো সেরকম একটি চূড়ান্ত ভারসাম্য কখনোই আসেনা, তবে সব সময় বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে একটি অস্থায়ী স্থিতি থাকে। নব্বই এর দশকে প্রতিষ্ঠিত এই নূতন তত্ত্বকে বিশৃঙ্খল (ক্যাওটিক) জীবসমাজ তত্ত্ব নাম দেয়া হয়েছে। কোন কোন বাস্তব পরিবেশে ব্যাপারটি বেশ স্পষ্ট। যেমন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে জীববৈচিত্রের পালা বদলে কখনোই স্থায়ী স্থিতি বা ক্লাইম্যাক্স আসেনি। সব সময় নানামুখি প্রজাতি বদল হতে দেখা গেছে, এখনো দেখা যাচ্ছে। সাধারণভাবে এ তত্ত্ব প্রমাণিত হয়েছে কম্পিউটার মডেলিং এর মাধ্যমে। কম্পিউটারে পরিবেশের

উপাত্ত থেকে এক একটি কাল্পনিক জীবসমাজ সৃষ্টি করা হয় (সিম্যুলেশন)। তারপর ঐ উপাত্তের ভিত্তিতে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় তাতে পরিবর্তন আসতে দেয়া হয়। দেখা যায় এই কাজের প্রত্যেক বারে ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গির প্রজাতি বদল হতে থাকে এবং এদের প্রত্যেকটি একটি সাময়িক স্থিতি দিতে পারে। এভাবে গাণিতিক মডেলিং এ এখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে প্রত্যেক জীবসমাজ ক্রমে পুনর্গঠিত হচ্ছে। এর মধ্যে খাদ্যজাল, আগন্তুক প্রজাতির প্রবেশ্যতা বা অপ্রবেশ্যতা ইত্যাদির পরিবর্তন হচ্ছে, প্রজাতিগুলোর নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে। আবার ঐ বিক্রিয়াই এসব বিষয়ে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। মোটের উপর প্রজাতি ভারসাম্য বলতে এতদিন আমরা যে অনড় বিষয়কে বুঝতাম এখন তা আর মনে করা হয়না। বরং ভারসাম্যকে একটি জটিলতর চলমান বিষয় হিসাবেই নিতে হচ্ছে। এটি জীববৈচিত্রের গতি প্রকৃতি বুঝাটাকে সেদিক থেকে কঠিন করে তুলেছে।

দ্বীপের জীব-পরিবেশ

জীব বৈচিত্রকে অনুধাবনের ক্ষেত্রে দ্বীপের জীব পরিবেশে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এর কারণ দ্বীপে সব জীবকে বাইরে থেকে আসতে হয় এবং একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই বিবর্তিত হতে হয়। তাই এর উপর গবেষণা অনেক কিছুর উদ্ঘাটনকে সহজ করে দেয়। ১৯৬৩ সালে এ সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ তত্ত্ব দেয়া হয় যাতে দেখানো হয় যে মূল ভূখণ্ড থেকে প্রজাতি গিয়ে দ্বীপে বসতি স্থাপন করে তার উপরেই সেখানে জীবসমাজের স্থিতাবস্থা নির্ভর করে। যে সব প্রজাতি দ্বীপে বিলুপ্ত হয় তাদের স্থান দখল করে নূতনভাবে আসা বসতি স্থাপনকারীরা। দ্বীপের জীবসমাজের স্থিতাবস্থা ও তাতে প্রজাতি সংখ্যা নিয়ামক নির্ধারণ করতে হলে ঐ সব প্রজাতির মধ্যে কারা কারা আছে, ওরা জীব পরিবেশে কী রকম ভূমিকা রাখে, ওদের ভূবন কী রকম– এসব বিবেচনায় আনতে হয় না। বরং এটি নির্ভর করে শুধু ঐ দ্বীপে আগন্তুক প্রজাতির সংখ্যা আর বিলুপ্ত প্রজাতির সংখ্যার উপর।

১৯৬৩তে দেয়া এই তত্ত্বটির একটি চমৎকার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৬৭ সালের খুবই চমকপ্রদ পরীক্ষার মাধ্যমে। আমেরিকার ফ্লোরিডার উপকূলের কাছে কয়েকটি খুব ছোট ছোট জনমানবশূন্য দ্বীপ ছিল যা শুধু কীট পতঙ্গ অধ্যুষিতই ছিল। ওখানে শুমারির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাচুর্য নির্ণয় করা হয়েছে এবং তারপর বিষাক্ত মিথাইল ব্রোমাইড প্রয়োগ করে সব প্রজাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে। একেবারেই জীবশূন্য অবস্থা থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে এখানে আবার

জীব বসতি গড়ে উঠেছে মূল ভূখণ্ড থেকে আগমনের ফলে। মাত্র ৮ মাসের মধ্যে সবগুলো দ্বীপে আগের সমান প্রজাতি বৈচিত্র পুনপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে এখন সব প্রজাতি আর আগেরগুলো নয়, ভিন্ন সমন্বয়ে এরা মূল ভূখণ্ড থেকে এসেছে। এদের মধ্যে যে দ্বীপ মূল ভূখণ্ডের বেশি কাছে সেটিতে নূতন বসত গড়ায় স্থিতি এসেছে অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি, যেটি যত দূরে তাতে তত বিলম্ব ঘটেছে। এতে সেই তত্ত্বটি চমৎকার ভাবে প্রমাণিত হলো যাকে এখন জীব পরিবেশের নিরপেক্ষ তত্ত্ব বলা হয়। এতে সব কিছু শুধু প্রজাতি আগমণ ও প্রজাতি বিলুপ্তির উপর নির্ভর করছে– প্রজাতির প্রকারের উপর বা তাদের আচরণের উপর নয়। এখানেই আধুনিকতর তত্ত্ব পুরানো প্রতিষ্ঠিত মতবাদকে বাতিল করছে। আগে প্রজাতির নিজস্ব আচরণে তার ভূবন রচনার উপর জীববৈচিত্রকে যতখানি নির্ভরশীল মনে করা হতো এখন তা মনে করা হচ্ছে না। জীবসমাজের স্থিতিশীলতায় এগুলোর গুরুত্বের চেয়ে নতুন বসতি স্থাপন এবং বিলুপ্তির প্রাধান্যটিই বড় হয়ে উঠেছে। বিলুপ্তি কমিয়ে নূতন আগমণ বাড়াতে পারলে এক একটি স্থানে আরো বৈচিত্রের দিকে নূতন স্থিতাবস্থা লাভ সম্ভব। আর উল্টোটা ঘটলে বৈচিত্রে টান পড়ার কথা।

বাদল বনঃ জীববৈচিত্রের আকর

বাদল বনের প্রকৃতি

নিরক্ষ রেখার কাছে ধারে উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে রয়েছে সারা বছর প্রায় প্রতিদিনকার বৃষ্টি স্নাত অত্যন্ত ঘন বন। সেগুলোই রেইন ফরেষ্ট বা বাদল বন। আজ জীববৈচিত্র নষ্ট হবার ক্ষেত্রে এই বাদল বনের বিনষ্টিটিই সবার সামনে খুব বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে, কারণ এখানেই রয়ে গেছে দুনিয়ার জীববৈচিত্রের বড় আকর। এখানে তা ধ্বংস হওয়াটি হবে সব চেয়ে বেশি আত্মঘাতী। বৈচিত্রের আসল রূপ দেখতে হলে এর দিকেই তাকাতে হবে। পৃথিবীর বহু কোটি বছরের ইতিহাসে অতীতে এক সময় দক্ষিণের সব মহাদেশ এক সঙ্গে একত্রে সংলগ্ন হয়ে ছিল। তখন এর উষ্ণ অঞ্চল জুড়ে ঘন বাদল বনের সূত্রপাত হয়েছিল। পরে

পৃথিবীর বাদলবন বন্টন

বিভিন্ন মহাদেশ আলাদা হয়ে গেলেও তাদের মধ্যে আজো সেই বন যথেষ্ট জায়গা জুড়ে রয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকায় আমাজন এবং ওরিনোকা নদী অববাহিকায় রয়েছে সব চেয়ে বড় বাদল বন, প্রায় ৪০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ ও অষ্ট্রেলিয়ার একেবারে উত্তর অঞ্চলে রয়েছে ২৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বাদল বন। বলা যায় বাংলাদেশের বনও এর কিনারায় রয়েছে– সে রকম ঘন না হলেও, সারা বছর বৃষ্টি বিধৌত না হলেও। অন্যদিকে আফ্রিকায় কঙ্গো অববাহিকা ও পূর্ব আফ্রিকার কিছু অংশে রয়েছে ১৮ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের মত বাদল বন।

বিভিন্ন মহাদেশের এ সব বাদল বনের উদ্ভিদ ও জীব প্রজাতিতে কালক্রমে ভিন্নতা সৃষ্টি হলেও অনেক দিক থেকে তাদের প্রাচীন সাদৃশ্যটি রয়ে গেছে।

বনের মধ্যে নানা কারণে সৃষ্টি হয় কিছ কিছু বৃক্ষহীন ফাঁকা জায়গা। অন্য জায়গাগুলো উঁচু বড় গাছের নিরবিচ্ছিন্ন শামিয়ানায় ঢাকা থাকে বলে এই ফাঁকগুলোতেই (গ্যাপ) শুধু সূর্যের আলো বনের তল পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। কাজেই সেখানে শুরু হয় নূতন চারার বেড়ে উঠা। এই বৃক্ষহীন ফাঁকের এলাকা, অনুচ্চ বৃক্ষের বিকাশমান এলাকা এবং ঘন বনের পরিপক্ক এলাকা– এই তিন ধরনের অংশ ছোপ ছোপ পরস্পর সংলগ্ন হয়েই গড়া বাদল বন– এদের গড়া মোজাইকের মত। এখানে পালাবদলের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যে বৃক্ষ প্রজাতিগুলো প্রাধান্য পেয়েছে সেগুলো ক্লাইম্যাক্স প্রজাতি। এগুলোর বীজ ও চারা শামিয়ানার তলায়ও বেঁচে যেতে পারে– পরে সেখানে ফাঁক সৃষ্টি হলে সে সুযোগে বড় বৃক্ষ হয়ে উঠে। অন্যদিকে আরো কিছু প্রজাতি থাকে যেগুলো শুধু ফাঁকের সুযোগেই নূতন আসতে পারে, এখানে আলোতে অঙ্কুরিত ও চারা হয়ে উঠতে পারে। এদেরকে পাইওনিয়ার প্রজাতি অর্থাৎ নবযাত্রিক প্রজাতি বলা হয়। বড় ফাঁক পেলে এরা দ্রুত শাখা প্রশাখা বেড়ে উঠতে চায় অন্যদের গজাতে না দিয়ে। কিন্তু ক্লাইম্যাক্স প্রজাতির বৃদ্ধি ঘটে অপেক্ষাকৃত ধীরে। এদের কাঠের ঘনত্ব বেশি, শামিয়ানার নিশ্ছিদ্রতাও বেশি। পাইওনিয়ার প্রজাতি প্রাধান্য থেকে পালা বদলের মাধ্যমে বন ক্রমে ক্লাইম্যাক্স প্রজাতিগুলোর প্রাধান্যের দিকে এগোয়। বনেদি এই ক্লাইম্যাক্স প্রজাতির চারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে পাইওনিয়ার বৃক্ষের নিচে। যেখানেই পাইওনিয়ার শামিয়ানায় উপযুক্ত ফাঁক সৃষ্টি হয় সেখানেই এরা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে।

বাদলবনের গঠন

বনে উদ্ভিদ বিচিত্রা

আমাদের আড়াই লক্ষ সপুষ্পক উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে এক লক্ষ সত্তর হাজার প্রজাতিরই উপস্থিতি রয়েছে বাদল বনগুলোতে। এর মানে উদ্ভিদের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ প্রজাতি বেঁচে থাকবে যদি শুধু বাদল বনগুলো বেঁচে থাকে। অসংখ্য বিচিত্র বৃক্ষ এখানে, যাদের শিকড় ও কাণ্ডের বৈচিত্র দেখলে অবাক হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে কাণ্ডের সঙ্গে রয়েছে অদ্ভূত সব ঠেকনা। আর উপরে উঠে এদের শাখা প্রশাখা আর ঘনপত্র বিস্তার রচনা করেছে প্রায় নিরবিচ্ছিন্ন শামিয়ানা। শিকড়, ঠেকনা, কাণ্ড, কাণ্ডের আবরণ বাকল– এর প্রত্যেক ক্ষেত্রে নানা প্রজাতির বৃক্ষগুলি নানা বৈশিষ্টময়। অনেক ক্ষেত্রে গোড়া থেকে শামিয়ানা পর্যন্ত পুরো বৃক্ষ প্রায় ঢাকা রয়েছে দীর্ঘ সব ক্লাইম্বার লতায় আর আশ্রিত বায়ুজীবি এপিফাইট উদ্ভিদে। সব মিলে সে এক জটিল বিচিত্র জগৎ।

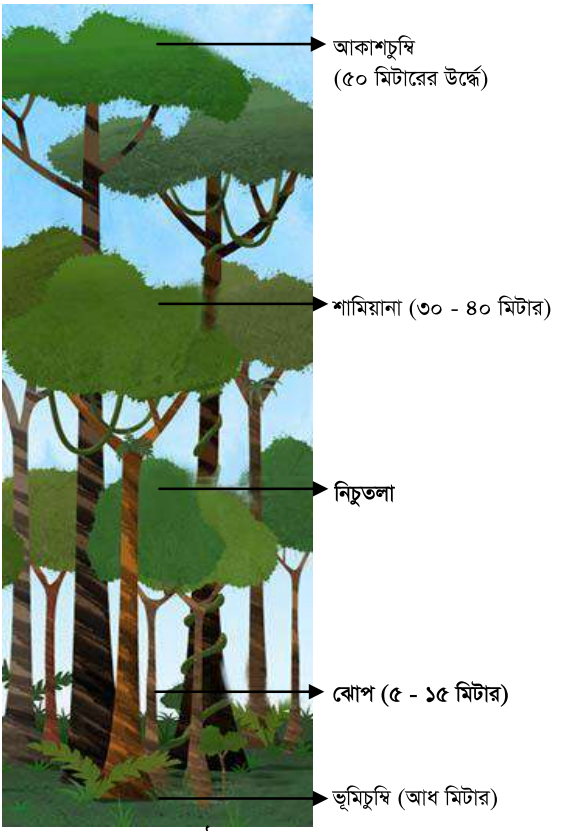

বাদলবনের গঠন

উপরের শামিয়ানা গড়ে উঠে উচ্চতম বৃক্ষগুলোর শাখা ও পাতার বিস্তারে। নীচের স্তরে রয়েছে অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ বৃক্ষগুলো। শামিয়ানার ফাঁকগুলোর সুযোগ এরা নিয়েছে। তারো নীচে আছে ঝোপ-ঝাড়। বনের মেঝেতে রয়েছে ভূমি সংলগ্ন নানা গুল্ম। তাছাড়া বিভিন্ন বাদল বনের থাকে নিজস্ব বৈশিষ্টময় বীরুৎ। যেমন এশিয়ার বনে বাঁশ, কলা এগুলো প্রাধান্য পায়, দক্ষিণ আমেরিকায় হেলোকোনিয়া।

উদ্ভিদ বৈচিত্রের ধরন নির্ভর করে স্থানীয় ভাবে প্রজাতির প্রাপ্যতার উপর। ঘূর্ণিঝড় বা অন্যান্য বিপর্যয়ের ফলে বনে ব্যাপক ফাঁকের সৃষ্টি হলে সেখানে নূতন পাইওনিয়ার প্রজাতি প্রতিষ্ঠার সুযোগ বাড়ে। এভাবে বনে সৃষ্টি হয় এক একটি নিরবিচ্ছিন্ন উদ্ভিদ বীথি। একটি বীথির মধ্যে উদ্ভিদ এত নিরবিচ্ছিন্ন থাকে যে বৈচিত্র বেশি চোখে পড়েনা। তবে বনের মধ্যে স্থানবৈচিত্র ঘটলে সেখানে স্পষ্ট নূতন ধরনের প্রজাতির বীথি দেখা দেয়। যেমন নদীর ধারের গাছগুলো আলাদা হতে পারে, উপকূলে ম্যাংগ্রোভ জাতীয় বৃক্ষগুলোও বেশ পৃথক বৈশিষ্টময় হয়। তেমনি বনের একেবারে অভ্যন্তরে কিংবা উচ্চভূমিতে সেখানকার বৈশিষ্টপূর্ণ বীথির সৃষ্টি হয়। বৈচিত্রের অনেকখানি নির্ভর করে স্থানীয় মাটির গুণাগুণের উপর। শামিয়ানার ছায়ার নীচেও বেঁচে থাকতে পারে বনেদি ক্লাইম্যাক্স প্রজাতির বীজ, চারা ইত্যাদি। এদের বন্টনের উপরও বৈচিত্র নির্ভর করে, কারণ ফাঁক সৃষ্টি হলে এরা সেখানে বীথি গঠনের সুযোগ পায়।

বনে প্রাণি বিচিত্রা

বাদল বনে উদ্ভিদবৈচিত্রটি যেমন সেখানে একজন ভ্রমণকারীর কাছে দ্রুত স্পষ্ট হয়ে উঠে, প্রাণিবৈচিত্রটি ঠিক তেমন নয়। কিন্তু আসলে দুনিয়ার প্রাণিবৈচিত্রেরও একটি বড় অংশের আকর এই বাদল বন। অনভ্যস্থ ভ্রমণকারী এর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় হয়তো ঝি ঝি ধরণের পোকার তালে তালে শব্দ, রক্তচোষা জোঁক এবং কামড়ানো কিছু পোকার বিরক্তিকর উপস্থিতিটিই চট্ করে লক্ষ্য করবেন, কিন্তু অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষণকারী অনুভব করবেন অসংখ্য বিচিত্র প্রাণির উপস্থিতি। বড় বড় প্রাণির পদচিহ্ন, মল ইত্যাদি তাঁর চোখে পড়বে। আরো চোখে পড়বে বৃক্ষের বাকলের উপর প্রাণির নখের আঁচড়, ভালুকের ভাঙ্গা মৌচাক, ময়ূর গোছের পাখির নাচের ফলে মেঝেতে কুড়ানো পাতা, বন্য শূকরের খোঁড়া মাটি, অথবা যেমন ধরা যাক বোর্ণিওর বনে বৃক্ষ শাখায় ওরাং ওটাং এর যত্ন করে তৈরি পাতার বিছানা– ইত্যাদি অসংখ্য চিহ্ন। অবশ্য চিহ্ন নয়

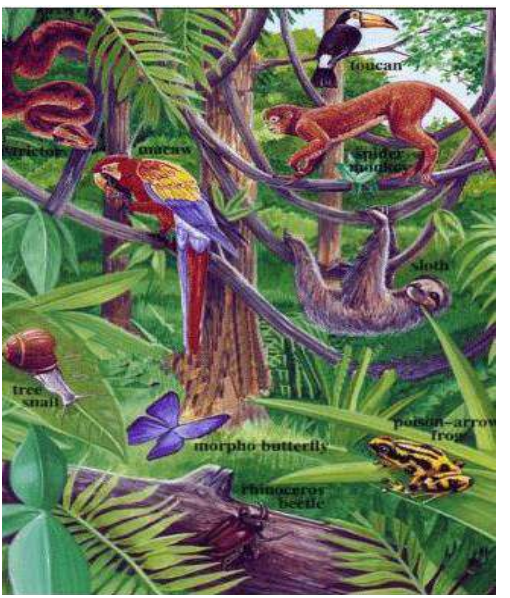

বাদলবনের জীববৈচিত্র

সত্যিকারের প্রাণি বেশি দেখতে চাইলে সময় নির্বাচনে ও পর্যবেক্ষণে আরো মনোযোগী হতে হবে। বিশেষ করে ভোরে ও সন্ধ্যায় পাখিরা যখন সক্রিয় হয়ে উঠে, অথবা রাতে স্তন্যপায়ীরা ও ব্যাং জাতীয়রা যখন বেরিয়ে আসে তখন তাদেরকে চোখে পড়ার সম্ভাবনা বেশি।

বাদল বনের জীববৈচিত্রের সিংহ ভাগই গড়া কীট পতঙ্গ পোকা মাকড় দিয়ে। আমাদের জানা এদের ১০ লক্ষ প্রজাতির অধিকাংশই এখানে রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি সমীক্ষায় এখানকার ১৯টি বৃক্ষে পূর্ণাঙ্গ জরিপ করে তাতে শুধু গুবরে পোকাই খুঁজে পাওয়া গেছে ৯৫৫ প্রজাতির। বড় প্রাণির মধ্যে চোখে পড়ার মত প্রাচুর্য হলো প্রাইমেটদের– যাদের মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার বনে নিউ ওয়ার্ল্ড বানর এবং এশিয়া ও আফ্রিকার বনে ওল্ড ওয়ার্ল্ড বানরের প্রজাতি সংখ্যা অনেক। বনের প্রাণির খাদ্যের মধ্যে টসটসে রঙীন ফলগুলো খুব বড় ভূমিকা পালন করে। আর এদের সবচেয়ে ভাল সদ্ব্যবহার করে বিচিত্র বানর এবং আরো বিচিত্র পাখির দল। বিশেষ করে আমাজনের বনতো পাখির স্বর্গ রাজ্য বলেই পরিচিত। সেখানকার নানা রঙে রঙীন তোতা বা টিয়া জাতীয় পাখিগুলো এক রকম বাদল বনের প্রতীক হিসাবেই দাঁড়িয়ে গেছে।

বনের উদ্ভিদ বিচিত্রার বড় অবদান হলো যে এরা একই এলাকার মধ্যে তাদের নানারকম খোপে খাপে অসংখ্য রকম ভূবন সৃষ্টি করে রেখেছে প্রাণিদের জন্য। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেই এসেছে এখানকার বিচিত্র প্রাণি। দিনের শুরু থেকে এদের কোন কোনটিকে অনুসরণ করা যাক। রাতে যারা মাটিতে কাটায় সেই কীটরা ভোরে রওয়ানা হয়ে গেছে গাছ বেয়ে বনের শামিয়ানায় চলে যাবে বলে– কারণ সেখানে তাদের প্রচুর খাদ্য। কিন্তু এই যাওয়ার পথে তারা

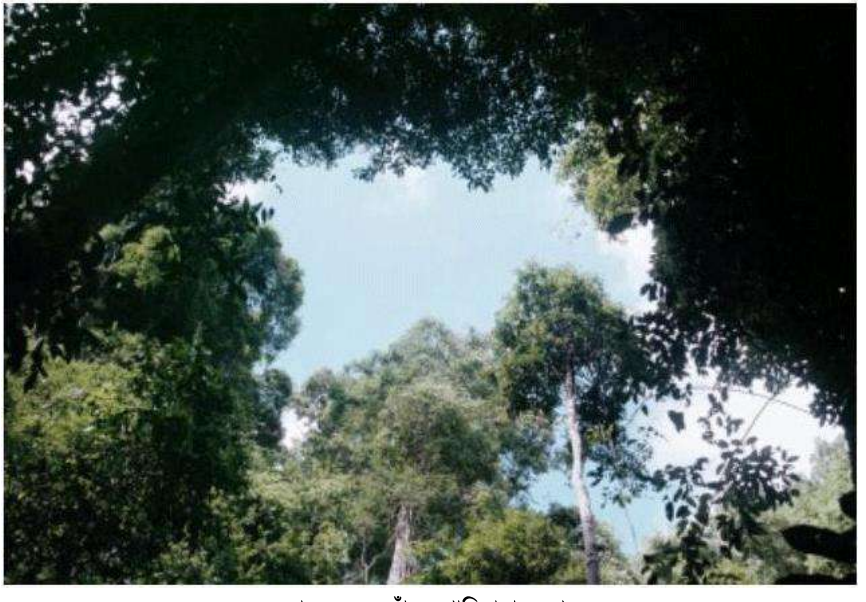

বাদলবনের ফাঁকঃ শামিয়ানায় দৃশ্য

নিজেরাও খাদ্যে পরিণত হতে পারে। এসময় গাছের গোড়ায় তাদের ধরার জন্য অপেক্ষায় থাকে ব্যাং, মাকড়সা, বৃশ্চিক ইত্যাদি। দিনের বেলায় অন্য অনেকের নির্দিষ্ট চলাফেরার এলাকাগুলো লক্ষ্য করা যেতে পারে– যাদের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য পতঙ্গ ও অনেক রকম গিরগিটি জাতীয় প্রাণি। এদের অনেকের চলাচলের পথ শামিয়ানার ভেতরেই। আবার শামিয়ানাতেই রয়েছে এখানে অশ্রিত বায়ুজীবি উদ্ভিদ অনেক রকম এপিফাইট– যেগুলোতে জমে খোলা পানি। এখানে এগুলো যেন রীতিমত একুয়েরিয়ামের কাজ করছে। কারণ এক পর্যবেক্ষণে এদের একটির মধ্যেই ৬৪ রকমের বিভিন্ন জলজ কীট পাওয়া গেছে। সাধারণত কয় রকমের ব্যাঙের কথাই বা আমরা জানি। আমাজন বনে তিন বর্গ কিলোমিটারের একটি ছোট এলাকাতেই ব্যাঙের প্রজাতি পাওয়া গেছে ৭৪টি, তাদের অনেকগুলোর বিচিত্র রঙীন চেহারা দেখলে তাক লেগে যায়।

এত বৈচিত্র্যের একটি কারণ হলো একই বনে একই জায়গায় বিভিন্ন প্রজাতি তাদের নিজস্ব সুবিধা অনুযায়ী 'ক্ষুদ্র-জলবায়ু' পেয়ে যায় বনের খোপে খাপে। এই ক্ষুদ্র জলবায়ুর নানা সমারোহ সৃষ্টি করে বনের উদ্ভিদ প্রজাতিগুলোই। তাই বনের শামিয়ানার বাইরে জলবায়ুর অবস্থা এক রকম, শামিয়ানার ভেতরে নানা জায়গায় নানা রকম। বিশেষ করে যখন শামিয়ানায় এক একটি ফাঁকের কাছে আসি– সেই ফাঁকের মাঝখানে উপরের আলো সরাসরি নেমে আসে বলে একরকম অবস্থা, ফাঁকের কিনারায় এসে সেটি বদলে যায়। কিনারা ছাড়িয়ে শামিয়ানার ভেতরে প্রবেশ করলে সেখানেও আলো আছে বটে কিন্তু শামিয়ানায় ঠিকরে ঠিকরে যেতে যেতে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ ও তীব্রতা অনেকটা বদলে যায়। ফাঁকের আকার আকৃতি বনের নীচের দিকের বহু ক্ষুদ্র জলবায়ুর প্রকৃতি ঠিক করে দেয়।

এত সব প্রাণির রসদ যোগাবার জন্য বনের প্রাথমিক সম্পদটি গুরুত্বপূর্ণ। এর নিরিখে একটি বন কত প্রাণির ভার বহন করতে পারে তার একটি সীমা রয়েছে– যাকে ক্যারিইং ক্যাপাসিটি বা ভার বহন ক্ষমতা বলা হয়। বনের প্রাণির একটি অতি বড় অংশ হলো মেরুদণ্ডীরা। তাদের অধিকাংশ ফলভোজী হওয়ার কারণে মন্দা মৌসুমে ফলের যোগানের উপরেই এই ভার বহন ক্ষমতা অনেকখানি নির্ভর করে। কয়েকটি ফল সারা বছরই পাওয়া যায়– তাই বনের জন্য এই ফল গাছের প্রজাতিগুলো কী-ষ্টোন প্রজাতি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এরা বিলুপ্ত হলে বা সংখ্যায় কমে গেলে বনের প্রাণিসমাজের অনেকের উপরেই তার প্রভাব গিয়ে পড়ে। ডুমুর এমনি কী-ষ্টোন প্রজাতি। নানা কারণে বনে এসবের স্থানীয় বিলুপ্তি ঘটতে পারে। তখন সাময়িকভাবে অনেকের ক্ষেত্রেই বিপর্যয় দেখা দেয়। কিন্তু

বাইরে থেকে নূতন ভাবে ঐ জরুরী প্রজাতিগুলো আসতে পারলে সুদিন আবার ফিরে আসে। অবশ্য বন যেভাবে দ্রুত চরমভাবে টুকরা টুকরা হয়ে যাচ্ছে তাতে স্থানীয় বিপর্যয় থেকে আবার জেগে উঠার সম্ভাবনা আর থাকছেনা।

বৈচিত্র সহায়ক আরো উপাদান

বাদল বনের পুষ্টিদ্রব্যগুলো সব সময় চক্রাকারে আবর্তন করে একে টেকসই করে রাখে। এখানে বৃষ্টির একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। ক্ষুদ্র কণিকার আকারে যে সব পুষ্টিদ্রব্য বাতাসে ভাসে, অথবা শামিয়ানায় বা বৃক্ষের গায়ে জমে, তা বৃষ্টির ফলে সব কিছুর ভেতর দিয়ে গড়িয়ে আবার মাটিতে আসে। দ্রবণীয় পুষ্টি উপাদানগুলো বৃষ্টির পানির দ্রবণ হিসাবেও নেমে আসে। ঝরে পড়া পাতাও পুষ্টিকে আবার মাটিতে নিয়ে যায়। মাটিতে জমে থাকা পুষ্টি গাছ তো গ্রহণ করেই ভূমির অবক্ষয়ে তা বাতাসেও যায়। এসবের মধ্যে মাটির জীবাণু, উই, কেঁচো ও অন্যান্য কীট যথেষ্ট কাজে আসে। চক্রাকারে আবর্তিত এই পুষ্টি বনের নানা জীবের জন্য নানা সুযোগ সৃষ্টি করে।

ইতোপূর্বে সাধারণভাবে জীবসমাজে যে প্রতিযোগিতা-সহযোগিতার বিষয় আমরা দেখেছি বনে তা অসংখ্য বৈচিত্র লাভ করে। প্রাণি ও উদ্ভিদের সহযোগিতার ক্ষেত্রে এখানে পরাগায়ন আর বীজ প্রসার– এ দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয়। পতঙ্গ, পাখি, বাদুড় পরাগায়নের কাজ করে। পাখিসহ অসংখ্য প্রাণি বীজ ছড়াবার কাজ করে ফল খেয়ে বীজ ফেলে দিয়ে অথবা মলের সঙ্গে বীজ ত্যাগ করে। বনের ফুলগুলো বিভিন্ন সময় ফুটছে বলে একই পরাগায়নকারী এক এক সময় এক একটি প্রজাতির সফল পরাগায়নে ব্যস্ত থাকতে পারে। তারপরও কিন্তু প্রবণতা দেখা যায় বিভিন্ন ফল একই সময়ে পাকতে– তাতে সব খাদকের চাহিদা মেটে, বীজ ছড়াবার কাজেও সুবিধা হয়। এভাবে সাধারণ ভাবে বহু প্রাণি যেমন সব উদ্ভিদের পরাগায়ন ও বীজ ছড়াবার কাজে লাগে, তেমনি আবার এ কাজে বিশেষজ্ঞরাও রয়েছে। নানা প্রজাতির পরাগায়নের জন্য নানা রকম প্রাণি সুবিধাজনক হচ্ছে– তাতে বৈচিত্র বেড়েছে। পাখি বেশি কাজে আসছে পুষ্ট কড়া রঙের ফুলের ক্ষেত্রে, বাদুড় কাজে আসছে কড়া ঝাঁঝালো গন্ধের রাতে ফোটা ফুলের জন্য। প্রজাপতি দিনের রঙীন ফুলে, মথ রাতের সাদা ফুলে, গুবরে পোকা খোলা বাটির মত ফুলে, অধিক কার্যকর হয়। বিশিষ্ট উদ্ভিদের বিশিষ্ট পরাগায়নকারী এভাবে রয়েছে। এই উদ্ভিদ তার পরাগায়নকারীর থেকে বিচ্ছিন্ন হলে ইকোসিস্টেম কী ভাবে ধীরে ধীরে ধসে পড়তে পারে। বন টুকরা টুকরা

হবার ফলে এমনটি কতখানি হচ্ছে, তার উপর এখন ব্যাপক ভাবে গবেষণা হচ্ছে।

বাদল বনের কান্না

পৃথিবীর জীববৈচিত্রের অনেক খানি জমা রয়েছে এর বাদল বনগুলিতে, অথচ সেই বাদল বন আমরা ক্রমে হারিয়ে ফেলছি। বাদল বন ধ্বংসের প্রক্রিয়া যদি বন্ধ না হয় তা হলে দুনিয়ার জীববৈচিত্রের ভবিষ্যৎ সত্যিই অন্ধকার। তাছাড়া বাদল বনগুলো যে সম্পদ আমাদের নিত্য যুগিয়ে চলেছে তাও তুচ্ছ করার মত নয়। একে টেকসই করতে না পারলে সে সম্পদও দ্রুত ফুরিয়ে যাবে। প্রধান সম্পদ যে মূল্যবান কাঠ, তা বলাই বাহুল্য। বিশেষ করে বাদল বনের ঘন শক্ত

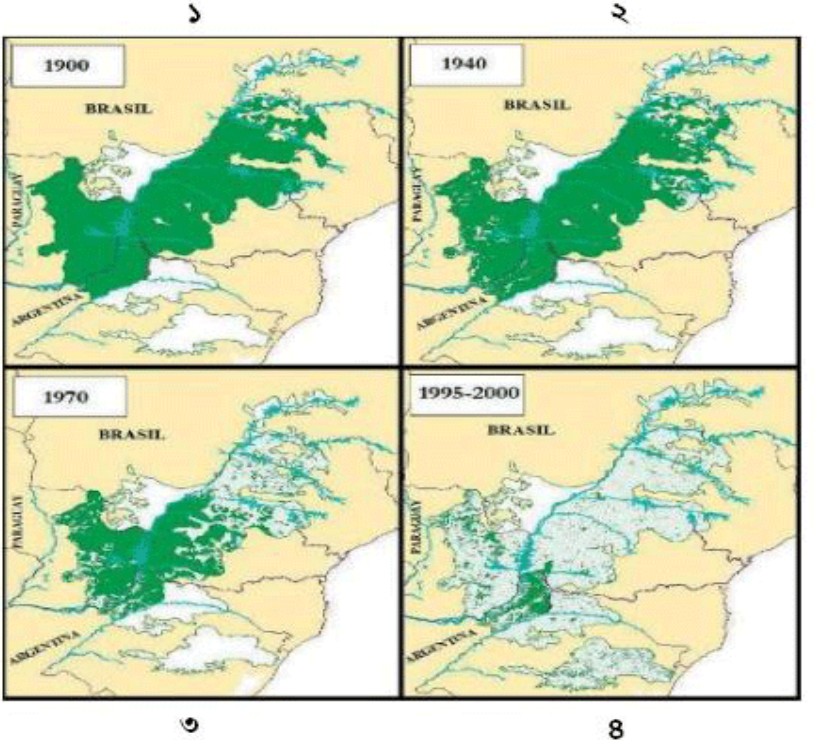

বাদলবন কীভাবে টুকরা টুকরা এবং বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছেঃ আমাজন (১৯০০, ১৯৪০, ১৯৭০, এবং ১৯৯৫ এর মানচিত্রে)

উন্নতমানের কাঠের প্রতি অতিলোভই আজ একে বিপন্ন করে তুলেছে। পৃথিবীতে এই মানের সব কাঠের অর্ধেকটিই এখনো আসে বাদল বন থেকে। অপেক্ষাকৃত

গৌণ সম্পদের মধ্যে আছে রাবার, রেজিন, বেত, টুকরা কাঠ ইত্যাদি। বনের থেকে পাওয়া খাদ্য সম্পদও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এরকম বন থেকে বহু দেশের অন্যতম প্রধান বাণিজ্য কফি, কোকো ও বিশেষ বিশেষ বাদামের মূল্যবান সরবরাহ এ বন থেকে। বনের প্রাণিজাত সম্পদও গুরুত্বপূর্ণ। সমস্যা হলো এ সব সম্পদ আহরণ যদি টেকসই অবস্থা বজায় রাখার সীমার মধ্যে না রাখা হয় তা হলে সেটি বন বিনষ্টির পর্যায়ে চলে যায়। এবং আসলে হয়েছেও তাই।

১৮৮০ থেকে ১৯৮০ এই এক শ'বছরে পৃথিবীর বাদল বনের ৪০% ধ্বংস হয়ে গেছে। তারপর এই ধ্বংসলীলা আরো ত্বরান্বিত হয়েছে। মেহগিনির মত শক্ত উৎকৃষ্ট কাঠের চাহিদা দুনিয়াতে বেড়েই চলেছে। অথচ এরকম একটি গাছ পূর্ণ বয়স্ক হতে ৩০ থেকে ৫০ বছর লাগে। স্থানীয় ভেষজ চিকিৎসার প্রয়োজন মেটাতেই আফ্রিকার বাদল বনের একটি বড় অংশ শেষ হয়ে যাচ্ছে। বনের অন্যান্য সম্পদের উপরও সৃষ্টি হয়েছে প্রচণ্ড চাপ।

বাদলবনকে গোচারণ ভূমিতে রূপান্ড়র

মানুষের নানা কাজের ফলে ক্রমাগত পৃথিবীর বাদল বন সংকুচিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বাদল বন বিনষ্টির হার ছিল গড়পড়তা বছরে এক শতাংশ করে। এই হার ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপর থেকে বিমানের ও উপগ্রহের নেয়া ছবি থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে কী হারে বাদল বন টুকরা টুকরা হয়ে যাচ্ছে এবং এর ভেতরে ক্রমে বিস্তৃত হচ্ছে বসত, কৃষি জমি, বাণিজ্যিক বাগান ইত্যাদি। এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে এভাবে চলতে থাকলে ২০৪২ সালের মধ্যে এখানকার অর্ধেক জীববৈচিত্র বিলুপ্ত হবে এবং তার অর্থ হবে পৃথিবীরও জীববৈচিত্রের একটি বড় অংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। দেখা যাক এই বনবিনষ্টিটি কী প্রক্রিয়ায় ঘটছে।

বাদল বনের মধ্য দিয়ে এখন তৈরি হচ্ছে হাজার হাজার কিলোমিটার রাস্তা। রাস্তা তৈরির বড় কারণ দ্রুত বিপুল পরিমাণ মূল্যবান কাঠ আহরণের সুযোগ সৃষ্টি। কাঠ আহরণের কারণে বনের যত না ক্ষতি হচ্ছে এই রাস্তা তৈরির কারণে ক্ষতি হচ্ছে তার চেয়েও অনেক বেশি। শুধু রাস্তার জায়গাটুকু নয় এর দুপাশের বিরাট জায়গাসহ প্রচুর বন এভাবে ধ্বংস হয়। তাছাড়া মাঝখানে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে জীববৈচিত্রের অবক্ষয়ের পথ করে দেয়া হয় এতে। রাস্তার সঙ্গে অবশ্য শুধু কাঠের জন্য গাছ কাটার সম্পর্ক নয়। যাতায়াতের সুব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বনের মধ্যে গড়ে উঠছে নূতন নূতন বসত, শহর, কৃষির আবাদ, রাবার, পাম ইত্যাদি একই গাছের বাণিজ্যিক আবাদ। বিভিন্ন মহাদেশে বিভিন্ন বনে এর প্রকৃতি বিভিন্ন রকম। দক্ষিণ আমেরিকায় বনে বন কেটে পশু চারণের ব্যবস্থাটিও গড়ে উঠছে– সৃষ্টি হচ্ছে বড় বড় র‍্যাঞ্চের। কোন কোন বনে খনি কোম্পানীগুলো মূল্যবান খনিজ আকরের সন্ধান পেয়ে বিস্তীর্ণ এলাকাকে খনিকরণের আওতায় নিয়ে আসছে। আধুনিক প্রযুক্তি ও শক্তিশালী যন্ত্রপাতি বন কেটে এসব করার কাজকে সহজ ও স্বয়ংক্রিয় করে তুলেছে। একই সঙ্গে এসব ভারী যন্ত্রপাতি বনের জীববৈচিত্রকে ক্ষতিগ্রস্থ করে ঐ কাজগুলোর জন্য যতখানি প্রয়োজন ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। মোট কথা বাদল বন এখন ব্যাপক ও বেপরোয়া বাণিজিকীকরণের শিকার। কোথাও কোথাও অবশ্য জনসংখ্যার চাপ, খাদ্যশস্যের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদিরও শিকার।

প্রয়োজনের কথা বল্‌লে বিশেষ করে এসব বনাঞ্চলের আদিবাসীদের কিছু কিছু জীবিকার কাজ চিরকাল বনকে টেকসই রাখার সীমার মধ্যেই পরিচালিত হয়েছে। যেমন জুম চাষের কথাই ধরা যাক। এতে বনের সীমিত জায়গায় গাছ কেটে দু'এক বছর শস্য ফলানো হয়। তারপর সেখানে দ্রুত বর্ধনশীল পাইওনিয়ার প্রজাতির বনকে গড়ে উঠতে দেয়া হয় ৮/১০ বছর ধরে। এভাবে মাটির পুষ্টিকে ঐ গাছের দেহে নিয়ে আসা হয়, বৃহত্তর পুষ্টি চক্রগুলো কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসে। তখন এগুলো কেটে পুড়ে ছাই করে ঐ মাটিতেই ফেলে রাখা হয়। এভাবে পুষ্টি মাটিতে যাওয়াতে এখন আবার বেশ কয়েক বছর ভাল ফসল পাওয়া যায়। এমনি ভাবেই চলতে থাকে। সীমার মধ্যে কাঠ আহরণ যেমন ক্ষতিকর নয়, সীমার মধ্যে জুম চাষও ক্ষতিকর নয়। কিন্তু ব্যাপক আকারে চলতে থাকলে এতে বন পুষ্টি হারিয়ে মূল্যহীন হয়ে পড়ে– জীববৈচিত্রের আবাস আর সেটি থাকেনা। শুধু বনের জায়গা দখলের জন্যই নয়, সারা দেশের বা অঞ্চলের উচ্চাকাঙ্খী ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনারও শিকার হচ্ছে বাদল বন। যেমন এখানকার নদীতে বাঁধ দিয়ে জল-বিদ্যুৎ, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিশাল প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে কিছু কিছু জায়গায়। বনের উপর এর ধ্বংস যজ্ঞ

অত্যন্ত ব্যাপক। বহু জায়গায় প্লাবিত বন পানির মধ্যে তলিয়ে গেছে। অনেক জায়গায় আগে যা বন ছিল এখন তা বিস্তীর্ণ জলা। এর সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে পৃথিবীর জীববৈচিত্রের মূল্যবান এলাকাগুলো।

অথচ সব বন বজায় রেখে, সেখানকার জীব সমারোহকে বিপর্যস্থ না করেও চলতে পারতো উন্নত বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পদের আহরণ– যাতে সবাই, বিশেষ করে স্থানীয় অধিবাসীরা উপকৃত হতো। বনের সুস্বাস্থ্যের জন্যই এক এক উদ্ভিদ প্রজাতির জন্য এক এক ধরনের ফাঁক বনে এমনিতেই প্রয়োজন। সেদিকে লক্ষ্য করে নির্বাচিত গাছ কেটে সেই রকম ফাঁক সৃষ্টি করলে বনের ক্ষতি হয়না। বেছে বেছে পুরানো পরিপক্ক গাছগুলোকে কাটলে ছোট ছোট ফাঁক হয়ে ক্লাইম্যাক্স প্রজাতির সুবিধা হয়। আবার সীমিত এক এক জায়গায় একাধারে সব বয়সী গাছ কেটে ফেললে অনেক বড় ফাঁক সৃষ্টি হয়ে পাইওনিয়ার প্রজাতিগুলোর সুবিধা হয়। বন ব্যবস্থাপনার এরকম কাম্য বেশ কিছু আধুনিক পদ্ধতি রয়েছে যাতে কাঠ সম্পদ আহরণ করা যেত পৃথিবীর বাদল বনকে টিকিয়ে রেখেই।

কিন্তু তার বদলে বাদল বনের কান্না আজ ক্রমে আরো করুণ হচ্ছে। এ কান্না শুধু বনের নয়, পৃথিবীর জীববৈচিত্রের সব চেয়ে বড় আকরের।

খাড়ি ও প্রবালঃ জীববৈচিত্রের অন্য আকর

খাড়িতে জীববৈচিত্র

স্থলের চেয়ে সমুদ্রে জীবের বসবাস ৩০০ গুণ বেশি কারণ সেখানে জীবন যাপন সহজতর। ভাসমান অবস্থায় থাকে বলে পানিতে জীবের পক্ষে নিজের ওজন বহন করা সহজ, এতে শক্তি কম দরকার হয়, নিজের মেরুদণ্ড ব্যবস্থাও কম মজবুত হলে চলে। খাদ্য সংগ্রহও এখানে সহজতর। নদী মোহনায় আংশিক স্থলে ঘেরা যে সমুদ্র খাড়ি সৃষ্টি হয়, জীববৈচিত্রের দিক থেকে এবং উৎপাদনশীল এলাকাগুলোর মধ্যে তার স্থান খুব উপরে। এখনকার প্রাথমিক উৎপাদন খুবই বেশি, ক্ষুদ্র উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনের অধিক সমারোহের কারণে। নোনা পানি ও মিঠা পানির সংযোগ স্থলে অবস্থিত খাড়ির জল প্রবাহ প্যাটার্নই একে উর্বর করে

খাড়ির ইকোসিস্টেম

তুলেছে। অপেক্ষাকৃত কম ঘন মিঠা পানি এখানে ঘন নোনা পানির উপরেই অবস্থান করে। পুষ্টিদ্রব্যগুলো এখানে সঞ্চিত হয় কিন্তু চট করে খোলা সমুদ্রে হারিয়ে যেতে পারেনা। এখানে সমুদ্রের তলার দিকেও আলজি, ঘাস ও উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনের প্রাচুর্য রয়েছে। খাড়ির অবস্থানের কারণে সাধারণত এর তীর বন্দর, নগর ও শিল্প ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ থাকে। এখানকার বর্জ্য জৈব পদার্থে সমৃদ্ধ থাকে বলে তাও জৈব পুষ্টির যোগান দেয়।

খাড়িতে ও সমুদ্রের অন্যান্য অংশেও আলো, উত্তাপ, লবণাক্ততা, চাপ, স্রোত– এসবই জীব পরিবেশের প্রধান নিয়ামক। পৃষ্ঠদেশ থেকে প্রায় ১৫০ মিটার পর্যন্ত গভীরতায় আলো গিয়ে পৌঁছে এবং প্রাথমিক উৎপাদন বজায় রাখে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশে ২৬° সেলসিয়াস গড়পড়তা উত্তাপ হলেও এটি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে প্রায় ৫ ডিগ্রিতে এবং মেরু অঞ্চলে শূন্য ডিগ্রির কোঠায় গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সব জায়গাতেই পৃষ্ঠদেশ থেকে যতই গভীরে যাব উত্তাপ ততই কমে যেতে থাকে। আলো ও উত্তাপের তারতম্য যেমন সমুদ্রে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের সৃষ্টি করে নানা স্তরে, তেমনি লবণাক্ততাও তা করে– আর নানা জীবের এসব সহ্য করার ক্ষমতা বিভিন্ন। মাছ ও অন্যান্য জলজ জীব সমুদ্র স্রোতের উপরও খুবই নির্ভরশীল। এসব নিয়ে গবেষণা চলে সমুদ্রের নানা জায়গায় নানা স্তরে ক্ষুদ্র থেকে বড় নানা জীবের সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে। যেমন সূক্ষ্ম জাল টেনে প্ল্যাংকটন সংগ্রহ করা হয়। আবার ডুবুরি নেমে বা ছোট ডুবো জাহাজের মত যানে গভীরে নেমে সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও জীববৈচিত্র নিয়ে গবেষণা চলে। সমুদ্রে শক্তি প্রবাহের পিরামিডের প্রতিটি স্তরে শক্তি অপচয়ের হার অপেক্ষাকৃত কম– তাই পিরামিডের ভূমি থেকে শীর্ষ পর্যন্ত স্তরের সংখ্যা স্থলের চেয়ে বেশি হতে পারে। সামুদ্রিক প্রাণির সবগুলো গোষ্ঠিতে ক্ষুদ্র থেকে বিশাল বিভিন্ন রকম প্রজাতি দেখা যায়। এখানে রয়েছে ক্রুসটাচিয়া গোষ্ঠির বিচিত্র রকমের ও আকারের চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদি। আর রয়েছে

সমুদ্রে অক্টোপাস জাতীয় প্রাণি

সমুদ্রের স্তন্যপায়ী

মোলাস্ক গোষ্ঠির প্রাণি স্কুইড, ঝিনুক, শামুক, স্লাগ ইত্যাদি। মাত্র ২/১ সেন্টিমিটার থেকে ২০ মিটার পর্যন্ত আকারের হতে পারে স্কুইডের নানা প্রজাতি। আর রয়েছে মাছ, মানুষ প্রধানত যেটির জন্য সামুদ্রিক প্রাণির দিকে মনোযোগ দেয়। সমুদ্রের কাছিম, সাপ প্রভৃতি সরীসৃপ এবং তিমি, ডলফিন, শুশুক, সীল, সিন্ধু ঘোটক ইত্যাদি স্তন্যপায়ী খুবই বিশিষ্ট। এর মধ্যে বিশেষ করে কাছিম এবং প্রায় সব স্তন্যপায়ী বিলুপ্তির হুমকির তালিকায় সবার উপরে রয়েছে। তিমি ডলফিন জাতীয় স্তন্যপায়ীর ৭৬টি প্রজাতি রয়েছে। বৃহত্তম প্রাণি প্রজাতি নীল তিমি এই গোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত। সীল, সিন্ধুঘোটক, ওয়ালরাস অন্য একটি সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী গোষ্ঠি যারা তীরে উঠে সেখানে কলোনি তৈরি করে। ডুগং, মানাতি, ইত্যাদি মিলে তৃণভোজী যে অন্য গোষ্ঠিটি তৈরি করে সেটিই আজ সব চেয়ে বিপন্ন।

সমুদ্রের আসল বড় কাম্য সমারোহ হলো মাছের। এর গৌণ গোষ্ঠি হলো নরম হাড়ের হাঙ্গর, রে, স্কেইট ইত্যাদি। আর মুখ্য গোষ্ঠি হলো স্বাভাবিক হাড়ের অন্যান্য সব মাছ– যাদের অন্তত ২০ হাজার প্রজাতি রয়েছে। আন্তর্জাতিক ভাবে মানুষের কাছে ব্যাপক প্রিয় মাছের মধ্যে রয়েছে ছোট হেরিং, পিলচার্ড, সার্ডিন, আনচোভি ইত্যাদি; মাঝারি কড, হেইক, পোলক ইত্যাদি; আর বড় টুনা, বারাকুডা ইত্যাদি এগুলো উপরের স্তরের মাছ। তলার দিকে রয়েছে সোল, হেলিবাট ইত্যাদি। মধ্য গভীরতায় অনেক মাছের জৈব আলো রয়েছে,

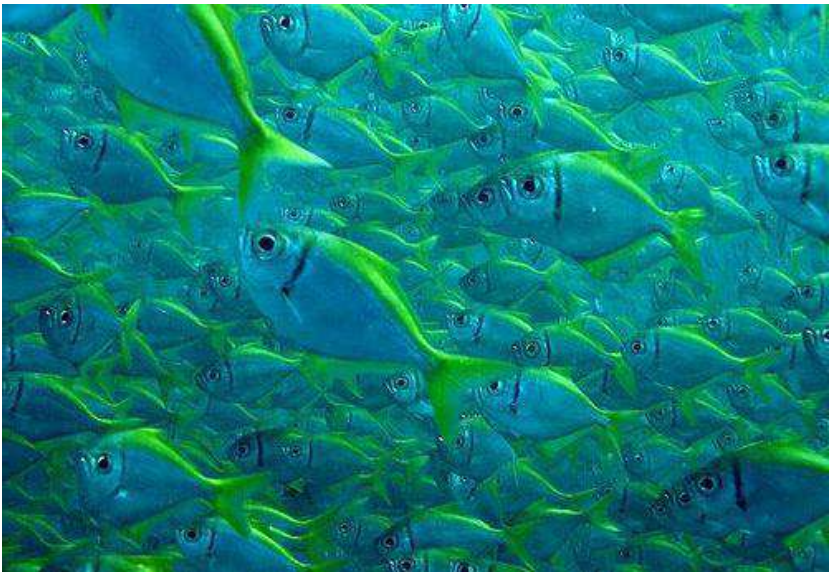

মাছের ঝাঁক (রূপচাঁদা)
ব্যবসায়িক গুরুত্বপূর্ণ মাছগুলো
অতিলোভের শিকার

তলদেশের মাছেরও রয়েছে তেমনি আলো। সমুদ্রের তলদেশে জীববৈচিত্রের অন্য রকম জগত। এখানে প্রধানত অল্প গভীর সমুদ্রে মাটিতে প্রোথিত সামুদ্রিক উদ্ভিদ– কেল্প, ঘাস, ম্যাংগ্রোভ, সী-উইড ইত্যাদি রয়েছে। প্রাণিদের মধ্যে বিশিষ্ট হলো একিনোডার্ম গোষ্ঠি– তারা মাছ, সমুদ্র শসা, সী-আরচিন, কাঁকড়া যাদের অনেকে তলায় বিচরণ করে, গর্তে থাকে। আরেক গোষ্ঠি– বারনাকেল, লিমপেট, মাসেল ইত্যাদি ঝিনুক জাতীয় প্রাণি তলার শিলার সঙ্গে নিজেদেরকে শক্ত করে আটকিয়ে রাখে। সমুদ্রে এসব জীববৈচিত্রের বড় সমারোহটা দেখা দেয় খাড়ি অঞ্চলে। এসব খাড়ি আর তার নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোতেই রয়েছে পৃথিবীর নামকরা সব মৎস্য ক্ষেত্রগুলো। প্রধানত এসব অঞ্চলগুলো থেকেই প্রতি বছর প্রায় সাড়ে আট কোটি টন মাছ ধরা হয়। এই পরিমাণ মাছ ধরতে গিয়ে আপনা থেকেই ধরা পড়ে বাড়তি আরো আড়াই কোটি টন মাছ ও অন্য জলজ প্রাণি, অপ্রয়োজনীয় বলে যাদের মৃতদেহ ফেলে দেয়া হয়। মাছ ধরাতে এই বাড়াবাড়ি ও বাছবিচারের অভাবের ফলে হ্রাস পাচ্ছে শুধু বাণিজ্যিক মাছ নয়, এর শিকার হচ্ছে সব রকমের জীববৈচিত্র। বেপরোয়া হস্তক্ষেপের ফলে মাছের অভিবাসন ও প্রজনন-ক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। অনেক মাছের অভিবাসনের সঙ্গে প্রজননের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যেমন পদ্মা-মেঘনা যমুনার খাড়ি থেকে ইলিশের মিঠা পানিতে আনাগোনায়, উত্তর আটলান্টিকে স্যামন, অন্যত্র শাদ, স্টুরজেন ইত্যাদির

অভিবাসনে। এরা সাধারণত মিঠা পানিতে ডিম দিতে আসে, কিন্তু বাচ্চা সমুদ্রে খাড়িতে যায় এবং বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকে। এরা এভাবে বার বার আসা যাওয়া করলেও প্রশান্ত মহাসাগরের স্যামন কিন্তু একবারই আসে মিঠা পানিতে, ডিম দিয়ে মারা যায়। অন্যান্য কিছু মাছের অভিবাসন ঠিক এর উল্টো। সাধারণত মিঠা পানিতে থাকে, ডিম দিতে যায় সমুদ্রে। এসব অভিবাসন এবং মৌসুমি খাদ্যের বাড়া কমার অনুসরণে সমুদ্রে এক এক প্রজাতির মাছের কোন কোন বড় বড় ঝাঁকে চলাচল লক্ষ্য করা যায়। মাছের স্থানীয় প্রাচুর্যের সঙ্গে ব্যবসায়িক লাভ জড়িত বলে এসবের উপর গবেষণা হয়েছে সব চেয়ে বেশি। কিন্তু আজ এই গবেষণাই দেখিয়ে দিচ্ছে যে মাছের একটি বড় অংশ এখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন। নিজেদের অভিবাসন আর ঝাঁকে চলার পথে এরা মানুষের সৃষ্ট নানা মারাত্মক বিঘ্নের সম্মুখীন হচ্ছে।

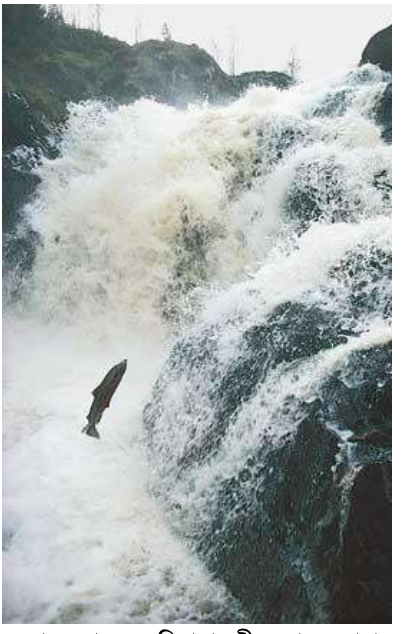

স্যামন মাছের অভিযাত্রা: তীব্র স্রোতও বাধা

ম্যাংগ্রোভ জলায় জীববৈচিত্র

খাড়ির মতই সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র দেখা যায় ম্যাংগ্রোভ জলায়। সুন্দরবনের উপকূলে খালে আর জলায় যার চমৎকার উদাহরণ রয়েছে। এখানে নোনা সহ্যকারী উপকূলীয় বন গড়ে ওঠে এবং তা সামুদ্রিক জলার জীববৈচিত্রকে একটি বিশিষ্টতা দেয়। ম্যাংগ্রোভের মধ্যে নানা এলাকায় লবণাক্ততা ও উত্তাপ বৈচিত্র খুব বেশি– জোয়ার ভাটার কারণে। তাই জোয়ার ভাটায় আগত মাছ, চিংড়ি ও অন্যান্য প্রাণির বৈচিত্র ও সমারোহ এখানে দেখা যায়। জোয়ার বেশি সবল

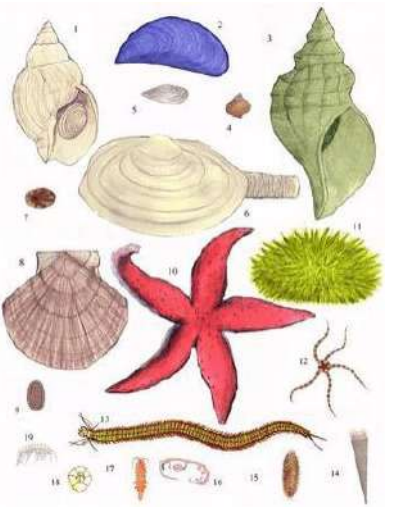

সমুদ্র তলের বিচিত্র প্রাণি

হলে এক জায়গার সংলগ্ন অন্য জায়গায় লবণাক্ততার হঠাৎ পরিবর্তনের প্রবণতা কমে যায়, জীববৈচিত্রও কমে। কিন্তু দুর্বল জোয়ারে এই রকম লবণাক্ততা পার্থক্য বজায় থাকতে পারে বলে তা জীববৈচিত্রের নানা সুযোগ করে দেয়। ম্যাংগ্রোভ উদ্ভিদের ঘন সংবদ্ধ শেকড় ইত্যাদির কারণে এখানে স্রোতের তোড় অনেক কমে যায়, ফলে পানির সঙ্গে পুষ্টিদ্রব্য এখানে আটকা পড়ে। লবণাক্ততা সহ্য ক্ষমতা অনুযায়ী নানা প্রাণি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে থাকতে পারে– সমুদ্রের দিকে সব চেয়ে বেশি লবনাক্ততা, তারপর ডাঙার দিকে ক্রমশ কম।

ম্যাংগ্রোভের জলজ প্রাণিরা জোয়ারের পানির উঠানামার সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয়, পানি নেমে গেলেই দেখা যায় তলদেশে বার্নাকেল, ঝিনুক, শামুক, কাঁকড়া, চিংড়ি ও নানা মাছের আনাগোনা। উদ্ভিদের জলমগ্ন শিকড়ের উপর আলজি, স্পঞ্জ, এনিমোন এবং অনেক রকমের মাছ। ওখানেও তলার মাটিতে পোকা মাকড়ের খোঁড়াখুড়ির ফলে বায়ুপূর্ণ অনেক কোটর সৃষ্টি হয় যা কিছু কিছু প্রাণির জন্য পানিতে ডুবে থাকা তলাতেই বাতাসের ব্যবস্থা করে। আসলে ম্যাংগ্রোভ বন এবং ম্যাংগ্রোভ জলা মিলে জীববৈচিত্রের এক চমৎকার আবাস গড়ে উঠে যা অর্থনৈতিক ভাবেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দরবন ছাড়াও বাংলাদেশে আরো ম্যাংগ্রোভ ছিল যা ইতোমধ্যে ধ্বংস হয়েছে। সুন্দরবনও বিপন্ন হতে বাকি নেই। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুনিয়ার প্রায় ৩৫% ম্যাংগ্রোভ ধ্বংস হয়ে গেছে।

প্রবাল কীট, প্রবাল দ্বীপ, প্রবাল প্রাচীর

পৃথিবীতে জীববৈচিত্রের যে কয়েকটি বড় আকর রয়েছে সমুদ্রে প্রবাল দ্বীপ ও প্রবাল প্রাচীর তার অন্যতম। আর এই দ্বীপ বা প্রাচীর গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্র প্রবাল কীটের দ্বারা। প্রবাল কীটের নিজেরই বহু বিচিত্র প্রজাতি রয়েছে। এদের মধ্যে কিছু পাথুরে প্রবাল মূল ভূখণ্ডের উষ্ণ সমুদ্র উপকূলের কাছাকাছি জায়গাতে

প্রবাল কীট ও আলজির পরস্পর-সহযোগিতায় গড়ে উঠে প্রবাল

অনেক সংখ্যায় কলোনি বানিয়ে ঐ দ্বীপ বা প্রাচীর গড়ে তোলে। প্রবাল কীট সী-এনিমোন গোত্রের একটি ছোট্ট সামুদ্রিক জীব, আকারে ১-৩ মিলিমিটারের মত। এর মূল দেহের সঙ্গে রয়েছে বেশ কিছু শুঁড় যেগুলো শিকার আর প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়। এই শুঁড়ে থাকে নেমাটোসিষ্ট নামের কিছু প্রাণি কোষ– শিকার কাছে আস্‌লে যা ফেটে পড়ে ভেতরের একটি পেঁচিয়ে থাকা সরু নল দিয়ে সজোরে আঘাত করে শিকারের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দেয়। এ কীট নিজের দেহ বিভক্ত করে প্রজনন করে, আবার পরস্পরের সঙ্গে শক্ত টিশ্যু দিয়ে সংবদ্ধ হয়ে বড় কলোনি গড়ে তোলে। বিভক্ত হয়ে প্রজনন ছাড়াও এরা যৌন প্রজননও

প্রবাল কীট

করে থাকে। কীটের শুরু হয় লার্ভার আকারে এবং এই লার্ভা দূরে দূরে ছড়িয়ে দিয়ে এরা কলোনি বিস্তার করে। প্রবাল কীটের আকার জটিল, কলোনির আকার আরো জটিল। কলোনিতে অসংখ্য ভাঁজ আর খোপখাপ। পরিবেশ, প্রজাতি, আকৃতি ভেদে এর মধ্যে অনেক বৈচিত্র– অন্য জীবের জন্য অনেক ভূবনের সুযোগ। কোন প্রবাল দেখতে শত ছিদ্র পাথরের মত, কোনটা নরম স্পঞ্জের মত, কোনটা মগজের মত কোঁকড়ানো, কোনটা নানারকম নলের সমষ্টির মত, আবার কোনটা উদ্ভিদের শাখা প্রশাখার মত।

প্রবালের গায়ের উপর এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে বাস করে এক ধরনের উদ্ভিদসদৃশ প্রাণি যা সলোক সংশ্লেষণে সক্ষম। এদের নাম জু-জেনথ্যালি। নানা রঙবস্তুর কারণে এরা বিভিন্ন রঙে রঙীন হয়। এরাই প্রবালকে এমন ফুলেল সৌন্দর্য দেয় যে অনেক জায়গায় অগভীর সমুদ্রে একে রীতিমত ফুলের বাগানের মত মনে হয়। পরিবেশ বিনষ্টির ফলে জু-জেনথ্যালি নষ্ট হলে প্রবাল তার এই

রঙীন সৌন্দর্য হারায়। প্রবালের সঙ্গে এর সম্পর্ক পারস্পরিক সহযোগিতার। এটি সালোক সংশ্লেষণ করে খাদ্য তৈরি করে প্রবালকে দেয়, প্রবাল তাকে আশ্রয় দেয়। জু-জেনথ্যালি ছাড়া বেশ কিছু আলজি ও অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণির সঙ্গেও প্রবালের এরকম দেয়ানেয়ার সম্পর্ক রয়েছে। ঐ অঞ্চলের যাবতীয় পুষ্টি উপাদান এভাবে কলোনির নানা সদস্যদের মধ্যে আভ্যন্তরীণভাবে আবর্তিত হয়, এবং ঐ অঞ্চলটি জীববৈচিত্রের জন্য খুব উর্বর জায়গায় পরিণত হয়।

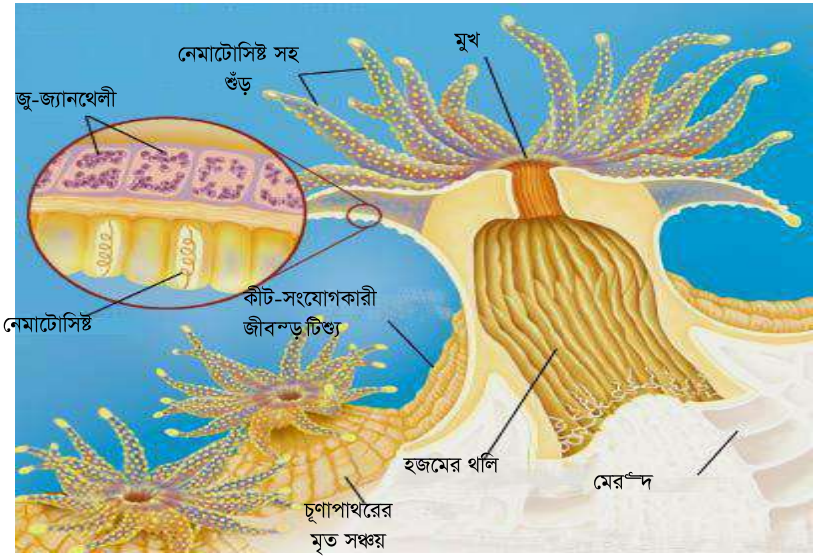

প্রবাল কীটের ব্যবচ্ছেদ

উর্বরতার সুযোগ নিয়ে প্রবাল কলোনির অসংখ্য খাদ, গর্ত, ফাঁক, সুড়ঙ্গ ইত্যাদির মধ্যে বিচরণ করে হরেক রকম প্রজাতি। ২০ লক্ষ বছর পুরানো অষ্ট্রেলিয়ার গ্রেট বেরিয়ার রীফ প্রবাল প্রাচীরেই পাওয়া গেছে ৩৫০ রকমের বিভিন্ন শক্ত প্রবাল, এতে চার হাজার রকমের স্কুইড, ঝিনুক, শামুক ইত্যাদি, আর দেড় হাজার রকমের মাছ। আর অন্যান্য সকল রকমের সামুদ্রিক জীবেরও বিরাট সমাবেশ ঘটেছে এখানে প্রবালকে আশ্রয় করে। তার জটিল গঠনের কারণে প্রবাল কলোনি যতটা না জায়গা দখল করে তার তুলনায় তার প্রকৃত তল অনেক গুণে বড়। ফলে সংলগ্ন হবার জন্য ও খাদ্য পাওয়ার জন্য তলের প্রাচুর্য এখানে জীববৈচিত্রকে উৎসাহিত করে। গ্রেট বেরিয়ার রীফ ছাড়া প্রবাল গঠনের অন্যান্য বিখ্যাত উদাহরণের মধ্যে আছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ মালদ্বীপ– যা পুরোটাই অনেকগুলো ছোট ছোট প্রবাল দ্বীপ দিয়ে গড়া। লোহিত সাগরের উপকূলের কাছে মিশরের শার্ম আল শেখেও যথেষ্ট বিখ্যাত প্রবাল প্রাচীর রয়েছে। প্রশান্ত

মহাসাগরের এটল দ্বীপগুলোও প্রবাল দিয়েই গড়া। বাংলাদেশে একটি মাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন টেকনাফ উপকূলের অদূরে। সাধারণত উপকূলের একটি অংশ পানিতে স্থায়ীভাবে ডুবে গেলে সেখানে সংলগ্ন হয়ে প্রথম প্রবাল কলোনি গড়ে উঠে। এটি গড়ে খুব ধীরে ধীরে, কোন কোনটি লক্ষ বছর ধরে। উপকূল আর প্রবাল কলোনির মধ্যবর্তী ভূমি দেবে গেলে দূরের প্রবাল প্রাচীরের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় দ্বীপের কাছে একে ঘিরে প্রবাল গড়লে এবং মূল দ্বীপটাই এ ভাবে ধসে গেলে একটি রিং এর আকারে বৃত্তাকার প্রবাল দ্বীপ গড়ে উঠে। এর মাঝখানের পানি বাইরের সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন বলে শান্ত স্রোতহীন থাকে। কাজেই সেখানে তলার উপর অনেক পলি জমে ও সেখানে তাই প্রবাল সংলগ্ন হতে পারেনা। কাজেই মাঝখানে প্রবাল গড়তে পারেনা বলে প্রবাল দ্বীপটি ঐ রিং এর আকারেই থেকে যায়। তাদেরকেই বলা হয় এটল– প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোর অনেকগুলোই এরকম এটল।

প্রবাল দ্বীপের এরকম সমৃদ্ধ জীববৈচিত্রে এখন আঘাত এসেছে প্রবাল দ্বীপগুলোর উপরেই আঘাত আসার ফলে। সে কথায় একটু পরে আসছি।

মানুষের সৃষ্ট বিপর্যয়

প্রথমে যদি খাড়ির দিকে তাকাই দেখি যে সব সুবিধা খাড়িকে জীববৈচিত্রে সমৃদ্ধ করে সেগুলোই এখন তার কাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এতে বিপর্যয় ঘটছে মূলত দুটি দিক থেকে– অতিরিক্ত সম্পদ আহরণ ও দূষণ। দুনিয়ার বিপুল চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে বেপরোয়া মাছ-শিকার এখন বিশাল শিল্পে পরিণত হয়েছে। অত্যন্ত দক্ষ ও বিশাল মাছ ধরা জাহাজ নিত্য নূতন কৌশলে এখন সমুদ্রের সব মাছ ছেকে তুলতে চাইছে।

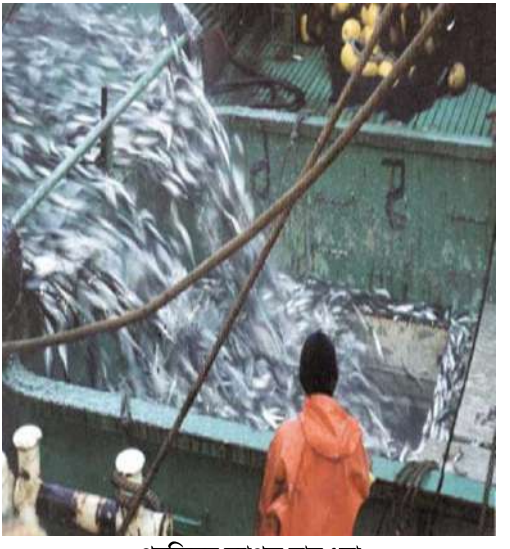

প্রযুক্তিঘন ব্যাপক মাছ ধরা

আন্তর্জাতিক ভাবে নানা বিধিনিষেধ দিয়েও এতে কুলানো যাচ্ছেনা। এভাবে মাছ ধরার বিপত্তি হলো মাছের প্রজনন ও টেকসই হবার সম্ভাবনাকে এতে বিনষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। সব চেয়ে ভয়ানক হলো ব্যাপক জায়গা জুড়ে একেবারে তলা ঘষে

জাল টানা যাতে তলার অনেক জীববৈচিত্র ধ্বংস হচ্ছে। শুধু তাই নয় আমরা দেখেছি এভাবে ছেঁকে তুলতে গিয়ে ব্যবসায়িকভাবে দরকারী মাছের সঙ্গে তোলা হচ্ছে বেদরকারী অসংখ্য প্রজাতি- যা তোলার ফলে মরে যাচ্ছে আর তা শুধু সমুদ্রে ফেলে দেয়া হচ্ছে। ফলে আরো অনেক প্রজাতিরও বংশ ধ্বংস হচ্ছে একই সঙ্গে। ব্যবসায়িক কারণে অনেক কিছু হস্তক্ষেপ হচ্ছে উপকূলের অদূরে– যেমন ঘের বা খাঁচা করে সেখানে চাষের মাধ্যমে সামুদ্রিক মাছের আবাদ। এরকম মাছের চাষের প্রচলন এখন দিন দিন বেড়ে চলছে এবং খাড়ি অঞ্চল সহ অনেক জায়গায় এর জন্য বাঁধ দেয়া হচ্ছে, ড্রেজিং করা হচ্ছে। এসবের ফলে বিচিত্র প্রাকৃতিক জলজ প্রাণির আবাসগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে জীববৈচিত্র দারুণভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

খাড়িতে সমুদ্রে অনেক ঘের তৈরি করে মাছ চাষ

খাড়িতে দূষণের ব্যাপারটি আরো ভয়াবহ। যে কারণে খাড়ির পুষ্টি-দ্রব্যগুলো সরে না গিয়ে তাকে উর্বর করতে পারে, সেই একই কারণে এখানকার দূষণ বস্তুগুলোও এখন সরে যেতে পারছেনা। অথচ খাড়ির চারিদিকে ঘনবসতির লোকালয়– শিল্প, কৃষি ইত্যাদির প্রাচুর্য থাকায় তার সব দূষণ এখানে জমা হচ্ছে। দূষণের একটি ফল হলো জৈব বৈর্জ্যের কারণে অতিরিক্ত সামুদ্রিক আলজি ইত্যাদির সমারোহে ওখানকার পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়, সব অক্সিজেন দ্রুত ব্যবহার হয়ে গিয়ে। এ অবস্থায় পানিটা 'মরা' পানিতে পরিণত হয়, অনেক জীবের প্রাচুর্য দ্রুত নেমে আসে, তাদের মৃতদেহ জমে

অবস্থার আরো অবনতি হয়। তীরের নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে অত্যন্ত বিষময় অনেক বর্জ্য এখন সাগরে এসে জমা হচ্ছে। এর মধ্যে পারদের মত ভারী ধাতু রয়েছে যা খাদ্য শৃঙ্খলে গিয়ে সব প্রজাতিকেই বিষময়তার শিকারে পরিণত করছে। যে পরিমাণ পিসিবি ও অন্যান্য প্লাষ্টিক দ্রব্য খাড়িতে পরিত্যক্ত হচ্ছে তা খেয়েও বহু প্রাণি মারা পড়ছে। এগুলো প্রাণির চর্বিতে দ্রবীভূত অবস্থায় জমা হয়। অন্যদিকে কৃষি জমি থেকে যাচ্ছে কীটনাশক বিষ যাও শুধু মাছ বা অন্য জলজ প্রাণিকেই নয় সামুদ্রিক পাখি, সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীদেরকেও বিলুপ্তির পথে ঠেলে দিতে সাহায্য করছে। এর সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে তেল দূষণ। তেলবাহী জাহাজ লীক করে তেল সমুদ্রে যাচ্ছে, বিশেষ করে উপকূলে তেল খালাসের সময়, এবং ট্যাঙ্কারের নেয়া পানির ভার ফেলে দেবার সময়। অগভীর সমুদ্রে যে তেলকূপ বসানো হচ্ছে তাতেও ছোটবড় দুর্ঘটনা ঘটছে। এমনটি ঘটলে অনবরত বিশাল পরিমাণ তেল সমুদ্রে গিয়ে মেশে। এমন দুর্ঘটনা ২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ উপকূলে ভয়াবহ পরিবেশ দূষণ সৃষ্টি করেছে। জাহাজ ভাঙ্গার সময় অথবা ট্যাঙ্কারকে ড্রাইডকিং করার সময়েও তেল দূষণ ঘটছে।

খাড়ির দূষণ

পানিতে গেলে তেল উপরে একটি পাতলা স্তর সৃষ্টি করে, সেখানে পানির মধ্যে একটি তেলের ইমালশন তৈরি হয় অনেকটা ফেনাদার নরম চকলেটের মত। এরকম ঘটলে উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাছসহ অনেক জলজ প্রাণি বিপন্ন হয়ে উঠে। এটি সবচেয়ে চাক্ষুষ দেখা যায় সামুদ্রিক পাখির ক্ষেত্রে। তাদের জন্য তেল দূষণ সরাসরি মৃত্যুর পরওয়ানা নিয়ে আসছে। পশমধারী সামুদ্রিক উদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা। ডানার পালকে বা পশমে তেল জড়িয়ে এদের শারীরবৃত্তিগুলো দ্রুত অচল হয়ে পড়ে। যারা বেঁচে যায় প্রজননের ক্ষেত্রে তাদের গুরুতর বিঘ্ন ঘটে। আজকাল সমুদ্রে এরকম তেল সংক্রান্ত বড় বড় দুর্ঘটনা

সমুদ্রে তেল-দূষণ

জীববৈচিত্রের জন্য এক একটি বড় বিপর্যয়ের আকারেই দেখা দিচ্ছে। খাড়ির আরেকটি দূষণ এত লক্ষ্য করা না হলেও বেশ বিপজ্জনক তা হলো উত্তাপ দূষণ। শিল্প-কারখানা বিদ্যুৎজনন কেন্দ্র থেকে উত্তপ্ত অথবা শীতল পানি এখানে পরিত্যক্ত হয়। দেখা গেছে উষ্ণ মণ্ডলীয় সমুদ্রে পানির উত্তাপ সামান্য ২/৩ ডিগ্রি বাড়লে বা কমলেই এখানকার জীবের উপর তার বড় প্রভাব পড়ে। স্কুইড জাতীয় জলজ প্রাণি ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের অধিক উত্তাপে মারা যায়। অথচ কারখানা থেকে ৪০/৪৫ ডিগ্রি উত্তপ্ত পানি প্রায়ই খাড়িতে যায়।

ম্যাংগ্রোভ জলার ক্ষেত্রে খাড়ির সব বিপর্যয় তো রয়েছেই এখানে অনেক জায়গায় ধান চাষ ও চিংড়ি ঘের তৈরি ম্যাংগ্রোভকে নষ্ট করে ফেলছে– সেই সঙ্গে তার সমৃদ্ধ জীববৈচিত্রকে। দুনিয়ার প্রায় অর্ধেক ম্যাংগ্রোভ এ ভাবেই নষ্ট হয়েছে। বাংলাদেশে সুন্দরবন, চকরিয়া সুন্দরবন তার বড় উদাহরণ। তাছাড়া পৃথিবীর নানা জায়গায় ম্যাংগ্রোভ অঞ্চলে সমুদ্র ড্রেজিং করে উপকূলের সঙ্গে মাটি জমিয়ে জমিয়ে স্থলভাগ বৃদ্ধি প্রকল্প নেয়া হচ্ছে। এর ফলে অনিবার্যভাবে ম্যাংগ্রোভ জীববৈচিত্র ধ্বংস হয়। ম্যাংগ্রোভ অঞ্চলগুলো প্রায়শ বড় বড় ঘুর্ণি ঝড়ের শিকার হয়। একবার এর বন ও আনুষঙ্গিক জলা এরকম বড় ঝড়ে বিপর্যস্থ হলে তা সেরে উঠতে ২৫/৩০ বছর পর্যন্ত লেগে যায়– এর মধ্যে অনেক জীববৈচিত্র বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকায় থাকে।

প্রবালকে ঘিরে জীববৈচিত্রগুলোও এখন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বিপদের সম্মুখীন। এর দুটি প্রধান কারণ– একটি জনসংখ্যার এবং পর্যটক সংখ্যার চাপ, অন্যটি হচ্ছে সম্পদ আহরণ ও উন্নয়ন কাজে বিনষ্টি ও দূষণ। কোন কোন প্রবাল দ্বীপ বেশ জনবহুল দেশে অবস্থিত। স্থানীয় জনসাধারণকে নির্ভর করতে হয় প্রধানত মৎস্য শিকার, পর্যটন শিল্প ইত্যাদির উপর। উভয়টিই বেপরোয়াভাবে চলার ফলে প্রবাল ধ্বংস হচ্ছে। শুধু সুন্দর স্মারক হিসাবে ঘর সাজাবার জন্য প্রবাল ভেঙ্গে বিক্রয়ের যে অবৈধ বাজার তাতেই বিপুল পরিমাণ প্রবাল ধ্বংস হচ্ছে। প্রবালের সৌন্দর্য যে জীবন্ত রূপে পানিতে, মৃত রূপে ড্রইংরুমে নয়, তা পর্যটকরা এখনো বুঝে উঠতে পারছেননা।

আজকাল যে সব যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মাছ ধরা হয় তাতেও প্রবাল ভেঙ্গে যাচ্ছে। প্রবাল জীববৈচিত্রের আরো বড় হুমকি হচ্ছে দূষণ। জন সংখ্যার চাপ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, পর্যটনের চাপ সবই দূষণ বাড়াচ্ছে। জৈব পদার্থ দূষণের ফলে প্রবাল কলোনিগুলোতে আলজির উৎপাদন বেড়ে যাচ্ছে। এরা প্রবালের জন্য উপকারী অন্যান্য জীবের জায়গা নিয়ে নিচ্ছে, প্রবালকে ঢেকে ফেলে তাতে আলো যাওয়া বন্ধ করে তাকে মেরে ফেলছে। তাছাড়া আলজি সমারোহের ফলে ওখানকার

পানিতে যে অক্সিজেন ঘাটতি হচ্ছে, তাতেও জীববৈচিত্র বিনষ্ট হচ্ছে। স্থানীয় অনেক উন্নয়ন প্রকল্প প্রচুর পরিমাণে পলি সৃষ্টি করে তাতে প্রবাল কীটের শুঁড়কে আটকে ফেলছে। শুঁড় স্বাভাবিকভাবে নড়ে চড়ে কাজ করতে না পেরেও প্রবাল মারা যাচ্ছে। বাণিজ্যিক স্বার্থ অনেক সময় এমন বেপরোয়া হয়ে যায় যে প্রবাল কলোনি থেকে পৃথিবীর অসংখ্য এক্যুরিয়ামের জন্য রঙীন মাছ, ষ্টার ফিশ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে বোমা বিস্ফোরণ, সায়ানাইড বিষ ইত্যাদি পর্যন্ত প্রয়োগ করা হচ্ছে। এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে মালদ্বীপে সাম্প্রতিক বিশ বছরে দুই লক্ষ কিউবিক মিটার প্রবাল শুধু সাজ-সজ্জার জন্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নষ্ট করা হয়েছে। ঐ দ্বীপপুঞ্জের অগভীর প্রবালের এক তৃতীয়াংশই ইতোমধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে। এ ধরনের বিনষ্টির রাশ টানতে না পারলে পৃথিবীর জীববৈচিত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্দর আকর আমরা শিগ্‌গিরই হারিয়ে ফেলবো।

মানবসৃষ্ট জীব বিলুপ্তির নানা কাহিনী

ঐতিহাসিক ধারা

মানুষ যখন থেকে শিকারির ভূমিকা নিয়েছে এখন থেকেই সে বেশ কার্যকর ভাবেই অন্য প্রাণিদেরকে ধ্বংস করে আসছে। খুব সম্ভব এ কারণেই মানুষকে সুদূর অতীতেও ক্রমাগত এক জায়গা ছেড়ে অন্য অন্য জায়গায় যেতে হয়েছে নূতন শিকারের সন্ধানে। বিশেষ করে গত দশ বিশ হাজার বছর ধরে মানুষের হাতিয়ার ও শিকার পদ্ধতি অনেক উন্নত হওয়ার ফলে বাইসন, হরিণ, ম্যামথ ইত্যাদি বড় বড় অনেক প্রাণি তাদের হাতে বিলুপ্ত অথবা প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। এই প্রক্রিয়া পূর্ণ মাত্রায় চলেছে দু'তিন শ বছর আগে পর্যন্ত। পরে শিকারের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা মানুষের সংখ্যা কমে গেলেও প্রাণি নিধন পর্ব কিন্তু শেষ হয়নি। গত কয়েক শত বছরের ইতিহাসেও আমরা আগন্তক মানুষের হাতে বিভিন্ন এলাকার ব্যাপক পশু পাখি সম্পদকে ধ্বংস হতে দেখেছি। এটি ঘটেছে আমেরিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, নিউজিল্যাণ্ডে, হাওয়াইতে এবং অন্যান্য অনেক জায়গায়। আদিবাসীদের হাতে এ নিধন হয়েছে, পরে নূতন কলোনি স্থাপনকারীরা যখন গিয়েছে তখনো হয়েছে।

আট হাজার বছর ধরে মানুষ যখন থেকে কৃষি কাজ করছে তখন থেকে শুরু হয়েছে অন্য ধরনের জীব-বিনষ্টি। কৃষির জন্য তারা নষ্ট করে চলেছে জীববৈচিত্রের আবাসগুলো। এখানে আবার নূতন উপসর্গও দেখা দিয়েছে। কৃষিকাজ করতে গিয়ে কিছু পশু পাখিকে মানুষ পোষ মানিয়েছে, গৃহপালিত করেছে। যখনই মনে করেছে অন্য কোন প্রাণি এই গৃহপালিতদের অসুবিধা ঘটাচ্ছে তখনই নির্মমভাবে তাদের বংশ ধ্বংস করেছে। আমেরিকার চারণ ভূমিতে তার ভেড়ার ঘাসে ভাগ বসাচ্ছে এই ভয়ে মানুষ সেখানকার বাইসন, প্রেইরী ডগ ইত্যাদিকে বিলুপ্তির দিকে নিয়ে গেছে ব্যাপক ধ্বংস লীলা চালিয়ে। একই ভাবে, একই কারণে ওখানে ধ্বংস করা হয়েছে নেকড়ে, কয়োট, ঈগল এবং আরো অনেক প্রাণি। এমনিতেও বহু মানুষের মধ্যেই বন্য প্রাণি মাত্রের প্রতিই কারণে-অকারণে এক ধরনের ক্ষতির ভীতি থাকে। এজন্যই শেয়াল, বেজি, সাপ, সজারু, বন রুই একটা কিছু দেখলেই হলো তাকে দল বেঁধে তাড়া করে পিটিয়ে না মারা পর্যন্ত স্বস্থি নাই। এই মনোভঙ্গি থেকেও যুগে যুগে অনেক প্রাণিকে বিলুপ্তির দিকে পাঠিয়েছে মানুষ। যাদেরকে সরাসরি মেরে ধ্বংস করেছে

তাদেরকে তো বটেই, কিন্তু এর ফলে খাদ্য শৃঙ্খলে গোলযোগ ঘটিয়ে অন্য প্রাণিদেরকেও বিপন্ন করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক ধারায় একেবারে অন্যভাবেও মানুষ প্রাণি বিলুপ্তির কারণ হয়েছে। কলোনি বিস্তারকারী আগন্তক মানুষ প্রায়ই এমন কিছু প্রাণি তাদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে যা ঐ জীব পরিবেশে আগে ছিলনা। এদেরকে ঢুকানোর ফলে স্থানীয় জীববৈচিত্রে চরম বিপর্যয় ঘটে গেছে অনেক ক্ষেত্রে। যেমন হাইওয়াইতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে আদিবাসীরা যখন প্রথম গিয়েছে, অথবা মরিশাস দ্বীপে ইউরোপীয়রা যখন প্রথম গিয়েছে, উভয় ক্ষেত্রে সঙ্গে নিয়ে গেছে তাদের পোষা কুকুর-বিড়াল ইত্যাদি। তাদের জাহাজের সঙ্গে, মালপত্রের সঙ্গে গিয়েছে ইঁদুর প্রভৃতি নানা অবাঞ্ছিতরাও। ওখানে আগে থেকে যে প্রাণিগুলো ছিল ক্ষতি করার মত স্থানীয় শিকারির অভাবে ওদের কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ফলে হঠাৎ এসব আগন্তক বিজাতীয় শিকারির হাতে তারা একদম কাবু হয়েছে এবং উজাড় হয়ে গেছে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে স্থানীয় প্রজাতিগুলোর ৯৫% এভাবে আগন্তকদের হাতে হয় বিলুপ্ত হয়েছে, নইলে বিপন্ন হয়েছে। মরিশাসের যে বিখ্যাত পাখি ডোডো গত কয়েক শত বছরের মধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে তাও এভাবেই হয়েছে। ব্যাপারটি যে সব সময় আগন্তুক প্রাণি কর্তৃক সরাসরি শিকারের মাধ্যমে হচ্ছে তাও নয়। এরা স্থানীয় প্রজাতি-ভারসাম্যে বিপত্তি ঘটিয়ে এবং ইকোসিস্টেমের সম্পদ ব্যবহারে বাধ সেধেও মারাত্মক ক্ষতি করছে। সুন্দর ফুলের জন্য দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আনা কচুরি পানা বাংলাদেশের জলজ ইকোসিস্টেমের কী দশা ঘটিয়েছে তাতো আমরা আমাদের নদী-নালা পুকুর বিলে দেখতেই পাচ্ছি। আজকাল বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ ব্যাপক ও সহজ হওয়াতে বিজাতীয় জীবের ফলে ক্ষতির ঝুঁকি অনেক বেড়েছে।

বাজার মূল্য চড়া হওয়াটি কাল হয়েছে

বাদল বনের ক্ষেত্রে কিংবা সমুদ্রের খাড়ি বা প্রবাল দ্বীপের ক্ষেত্রে জীববৈচিত্র নষ্ট করার প্রক্রিয়াগুলো কিছুটা আমরা দেখেছি। বসত বিনষ্টি ও বসতকে খণ্ড-বিখণ্ড করার মাধ্যমেই তার অনেকটা ঘটেছে। জীববৈচিত্র পছন্দ করে জটিল পরিবেশকে, কিন্তু মানুষের নানা কাজ সব সময় পরিবেশের সরলীকরণ করছে– যা জীববৈচিত্রের সহায়ক নয়। যেখানে বহু প্রজাতির উদ্ভিদের বনভূমি ছিল মানুষ সেখানে হয়তো তৈরি করে দিল একই পাম কিংবা নারকেল কিংবা রাবার বৃক্ষের বাগান, বাণিজ্যিক কারণে। এতে গাছ থাকছে বটে, কিন্তু সরলীকরণের ফলে জীববৈচিত্র আর থাকছেনা। একটি সাম্প্রতিক বিপন্ন প্রাণির উদাহরণ নেয়া যাক।

শ'খানেক বছর আগেও পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে ছিল সুমাত্রান গণ্ডারের বাস। এটি অপেক্ষাকৃত ছোট জাতের একটি গণ্ডার। সাধারণ গণ্ডারের মত নাকের উপর এটি বড় শিং থাকা ছাড়াও একটি ছোট শিং তার আছে। খুব একাকী থাকার অভ্যাস হলেও এ অঞ্চলের অনেক বনে প্রতিবর্গ কিলোমিটারে এক সময় ১২/১৪টি এরকম গণ্ডার ছিল। কিন্তু বন বিনষ্টির ফলে ১৯৮০'র দশকেই সব জায়গা মিলে এদের সংখ্যা মাত্র ৫/৬ শতের মধ্যে চলে আসে। তারপর অবস্থার আরো অবনতি হয়ে এখন মনে করা হচ্ছে মালয়েশিয়াতে শ'খানেক, বোর্নিওতে ৩০/৩৫টি, এবং মায়ানমার ও সুমাত্রাতে কয়েকটি ছাড়া এটি আর কোথাও তেমন নাই, এবং শিগগির সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবার আশঙ্কাতে রয়েছে। পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি মাত্র ছোট সীমিত জায়গায় বিচ্ছিন্ন হয়ে এর ভবিষ্যৎ শেষ হয়ে গেছে। সর্বত্রই একই কাহিনী– বন বিনষ্টি ও তার টুকরা টুকরা হয়ে যাওয়া। দলবদ্ধ হয়ে না থাকতে অভ্যস্ত এই প্রাণির জন্য এটি মারাত্মক হয়েছে। অন্যান্য গণ্ডারসহ এই গণ্ডারের ক্ষেত্রে আরো কাল হয়েছে এর শিং এর তথাকথিত ওষুধ গুণ। পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই শিং এর জন্য এত উচ্চ মূল্য দেয়া হয় যে এটি সর্বত্র এলোপাতাড়ি শিকারের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে।

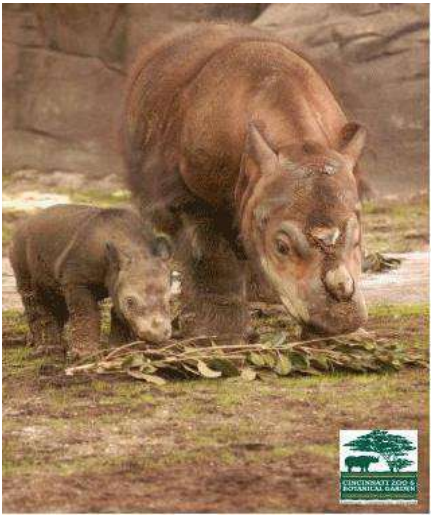

চিড়িয়াখানায় দুই শিং বিশিষ্ট সুমাত্রান গণ্ডারঃ এখন কয়েকটি মাত্র অবশিষ্ট

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বাণিজ্যিক মূল্য অনেক প্রাণির জন্যই এখন কাল হচ্ছে। এর আরেকটি বড়, বিশালাকায় বলি হতে যাচ্ছে হাতি– আফ্রিকান হাতি এবং এশীয় হাতি উভয়ে– হাতির যে দুটি প্রজাতি এখনো টিকে আছে। সব জায়গাতে বনবিনষ্টিতে হাতির বসত যে নষ্ট হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য– বিশেষ করে হাতির জন্য যে পরিমাণ উদ্ভিজ্জ খাদ্য লাগে এবং সেটির যোগানের জন্য যাতায়াতের যে গণ্ডি তার দরকার সেটি এখন তার পক্ষে পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বসত আর খাদ্যের অভাবে এরা যেমন বিপর্যস্ত, তেমনি বিপর্যস্ত নিজের দাঁতের জন্য। হাতির দাঁত চিরকালই মূল্যবান ছিল, কিন্তু এখন তার মূল্য আকাশচুম্বী হয়েছে। আফ্রিকান হাতির দাঁত বড়, এর সংগ্রহ ও বাজারজাতের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও মহামূল্যবান জিনিস হিসাবে হাতির দাঁতের চোরাচালান আর এর পেছনে

হাতি শিকার অপরাধী চক্র সক্রিয় রয়েছে। একই ঘটনা ঘটছে এশিয়াতে, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে। এখানে এবং চীনে হাতির দাঁতের অগ্নিমূল্য। আফ্রিকার বাজেয়াপ্ত করা হাতির দাঁত যখন খোলাবাজারে প্রতি কিলোগ্রাম ১৫০ ডলারে বিক্রয় হচ্ছিল, সেখানে ভিয়েৎনামে এর মূল্য চাওয়া হচ্ছিল কিলোতে ১৫০০ ডলার। এখানকার হাতি যে অবৈধ শিকারের ফলে বিপন্ন হবে তা আর বিচিত্র কী? সমীক্ষায় দেখা যায় যে এ অঞ্চলে লাওসের ৫০০ থেকে ১০০০টি হাতি আর ভিয়েৎনামের শ'দেড়শ হাতির কতগুলো বিচ্ছিন্ন দল ছাড়া আজ আর বেশি অবশিষ্ট নাই। এ অবস্থা চলতে থাকলে এশীয় হাতির বিলুপ্তি এখন সময়ের ব্যাপার। আফ্রিকান হাতিরও একই অবস্থা।

নানা ভাবে নানা মানুষের কাছে বিশেষ আদৃত হবার জন্য আরো অনেক প্রাণিকে বিলুপ্তির পথে যেতে হচ্ছে। যেমন হাঙ্গরের পাখনার কথাই ধরা যাক। এমনিতে খাদ্য হিসেবে হাঙ্গর মাছের খুব চাহিদা নাই। কিন্তু এর পাখনার তৈরি স্যুপ (শার্ক ফিন স্যুপ) কিছু কিছু দেশে অত্যন্ত উপাদেয় ও মূল্যবান খাবার হিসাবে পরিগণিত হয়। এ কারণে বিপুল সংখ্যায় হাঙ্গর শিকার করে শুধু তার পাখনাটি রেখে বাকি মৃতদেহ ফেলে দেয়া হয়। দুনিয়ার বহুদেশ থেকে এই হাঙ্গর পাখনার রফতানী বাণিজ্য রয়েছে তার উচ্চমূল্যের জন্য। একটি শীর্ষ খাদক হিসাবে হাঙ্গরের বিলুপ্তি সমুদ্রের জীবসমাজে অন্যত্রও আশঙ্কাজনক বিশৃঙ্খলা ডেকে আনবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাঘের সংখ্যা দ্রুত কমে যাওয়ারও কারণ একই– বাণিজ্য। বিশেষ করে চীনে বাঘের হাড়, দাঁত, ইত্যাদির একটি বড় বাজার রয়েছে সনাতন কিছু চীনা ঔষধে এসব উপাদান অত্যন্ত মূল্যবান মনে করা হয় বলে। কাজেই এসব অঙ্গের একটি বড় চোরাকারবার রয়েছে। তাছাড়া বাঘের চামড়ার অবৈধ ব্যবসা তো রয়েছেই। বিশেষ বিশেষ হরিণের শিংও এমনি একটি রমরমা ব্যবসার অংশ। আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে স্থানীয়দের মধ্যে গরিলা, ভালুক এবং কোন কোন বানরের মাংসকে অতি দামী ও উপাদেয় খাদ্য মনে করা হয়। তার একটি অবৈধ ব্যবসা ব্যাপকভাবে চালু থাকার ফলে এসব বিপন্ন প্রাণিকে মারার আয়োজন রয়েছে বহু কষ্ট স্বীকার করে হলেও। এসবের মাংস এখানে সামগ্রিক ভাবে 'বুশমীট' বা জঙ্গলের মাংস হিসাবে পরিচিত। অতি উন্নত দেশ জাপানের অনেক মানুষের কাছে তিমির মাংসের অদ্ভূত চাহিদা রয়েছে। ফলে উচ্চ প্রযুক্তি, বিশাল ফ্যাক্টরী জাহাজ ব্যবহার করে মহাসমুদ্রের বিশাল জায়গায় ব্যাপক তিমি শিকারের আয়োজন সে দেশ বজায় রেখেছে। এর উপর কড়াকড়ি আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও গবেষণা, কোটা ইত্যাদির আড়ালে জাপানী উদ্যোগে এখনো প্রচুর তিমি শিকার হচ্ছে এবং তিমির মাংসের একটি

শার্ক-ফিনের (হাঙ্গর পাখনা) বাজার দর অনেক

বাড়ন্ত বাজার সেখানে রয়েছে বলেই অনেকের ধারণা। এখানে স্মরণযোগ্য তিমি সব চেয়ে বিপন্ন প্রাণিদের মধ্যে একটি।

মৃত অবস্থায় ছাড়াও জীবন্ত বন্য প্রাণিরও চোরাচালানের বড় বড় চক্র রয়েছে– মানুষের পোষার জন্য, চিড়িয়াখানায় বিক্রির জন্য। গরিলার মত বিরল প্রাণির দাম দেড়-দুই লক্ষ ডলারে ঠেকতে পারে। এমনকি আমাজন বনের বৈশিষ্টময় একটি রঙ বেরঙের তোতার দামও ৩০/৪০ হাজার ডলারে উঠতে পারে। এসব প্রাণি ধরা, গোপনে চালান দেয়া ইত্যাদির প্রক্রিয়ায় প্রাণিগুলোর অনেকেই মরছে, বাকিরা অস্বাভাবিক বন্দীত্বের কারণে মরছে– তাদের বংশ ধ্বংস হচ্ছে।

বসত বিনষ্টির আরো কারণ

আপাত দৃষ্টিতে আমরা জমির উন্নয়ন করছি, কিন্তু সেটিই কারণ হচ্ছে জীববৈচিত্র নষ্ট করার। এমনকি বাড়ির কাছের ঝোপ জংলা কেটে পরিস্কার করলেই এমনটি হতে পারে, সব সময় হচ্ছে। ডোবা-জলা ভরাট করে কোন জায়গাকে ব্যবহারে আনলেও এটি ঘটে। নির্মাণের জন্য, কৃষির জন্য, এমনকি মশার উৎস ইত্যাদি নষ্ট করে রোগ দমনের জন্যও আমরা সব সময় জলা ভরাট করছি, আমাদের কাছে সঙ্গত কারণেই। কিন্তু এভাবে জলার অবসান হলে সেখানকার জীববৈচিত্রেরও অবসান ঘটে। কীট, পতঙ্গ, মাছ এসবতো যাবেই– কোন কোন জলায় যে বক, সারস, ডাহুক ইত্যাদিরও আশ্রয় ঘটে, তারাও আর থাকেনা।

ইউরোপীয় দেশগুলোতে কৃষি জমির সীমানায় ঝোপ-সারি থাকাটি একটি চিরন্তন নিয়ম। এক সময় জমির সীমানা নির্দেশের জন্য এটি দরকার হতো। এখন প্রধানত জমির অবক্ষয় ঠেকাতে, বাতাসের তোড় কমাতে এটি কাজে আসে। এক হিসাবে দেখা যায় যুক্তরাজ্যের উদ্ভিদবৈচিত্রের এক তৃতীয়াংশই রয়েছে এমনি ঝোপ-সারিতে। প্রাণিবৈচিত্রও সেখানে কম নয়– ঝোপ-সারিতে পাওয়া যায় অনেক রকমের পতঙ্গ, প্রজাপতিই রয়েছে ২৩ রকমের। আর রয়েছে ৬৫ রকমের পাখি এবং ২৮ রকমের স্তন্যপায়ী। সাম্প্রতিক কালে কৃষি জমি বাড়াবার জন্য, জমিতে ছায়া পড়া কমাবার জন্য, আর রোগ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির কারণে ঝোপ-সারি কমিয়ে ফেলা হচ্ছে। এটি এখানকার জীববৈচিত্রের জন্য দুঃসংবাদ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'সাধারণ কৃষি নীতির' আওতায় শস্যের অতিফলনে দাম পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জমির একটি অংশ প্রতি বছর অব্যবহৃত রাখার নিয়ম প্রচলিত হয়েছিল। দেখা গেছে ঐ এক বছরেই এখানে নানা উদ্ভিদ ও তাতে আশ্রয় করে নানা পাখি ও কীট পতঙ্গের চমৎকার জগৎ গড়ে উঠতো, যা জীববৈচিত্রে অবদান রাখতো। ২০০০ সালের দিকে শস্যের মূল্যের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটলে ঐ নীতি পরিত্যক্ত হয়েছে। এর প্রভাবে পরবর্তী দশ বছরে ওখানকার পাখি ও পতঙ্গের বৈচিত্রে স্পষ্ট বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে।

সার্বিকভাবে জীববৈচিত্র ধ্বংসের একটি বড় কারণ হয়ে পড়ছে ক্রমবর্দ্ধমান দূষণ। বিশেষ করে সমুদ্রের জীববৈচিত্রের ক্ষেত্রে এ দূষণের প্রভাব আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি। ব্যাপক দূষণ জীববৈচিত্রের প্রত্যেকটি আবাসকে এখন আক্রান্ত করছে। বাতাস ও পানিতে বাহিত হয়ে দূষণের আক্রমণ গিয়ে পড়ছে সর্বত্র। অন্যান্য ভাবেও দূষণ ঘটছে। যেমন নগরীর বর্জ্য ফেলার জন্য যে ভরাট করার বড় বড় নীচু জমিকে ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে বর্জ্যের কারণে কোন কোন ধরনের প্রাণি অতিমাত্রায় বিস্তৃতি লাভ করে– যেমন ইঁদুর, মাছি ইত্যাদি। এরা আবার এলাকার স্বাভাবিক জীববৈচিত্রকে স্বাস্থ্যকরভাবে বাঁচতে বাধা দিয়ে বৈচিত্রকে বিপর্যস্ত করে।

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন সাধারণভাবে ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা বাড়াচ্ছে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ার কারণে। এর ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর বহু অঞ্চল ক্রমশ উষ্ণতর হয়ে পড়ছে, আবার কোন কোন অঞ্চল সমুদ্র স্রোত ইত্যাদির পরিবর্তনে শীতলতরও হচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ উঁচু হওয়া সহ এর অন্যান্য নানা ফলশ্রুতিও এখন স্পষ্ট হয়ে

উঠেছে। অবক্ষয়ে এটিও নিশ্চিত ভাবে এখন অবদান রাখছে। অসংখ্য জীব প্রজাতি উত্তাপের আর্দ্রতার সামান্য হ্রাসবৃদ্ধিতেই খুব সংবেদনশীল। তাদের অনেকগুলোকে উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে শীতলতর অঞ্চলে অভিবাসী হতে দেখা যাচ্ছে। অনেকে সেটি করেও পার পাচ্ছেনা, পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে বিলুপ্তির পথে যাচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ মেরু অঞ্চলের শ্বেত ভল্লুকের প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক পরিবেশ চির-বরফ এখন সে আর সব জায়গায় পাচ্ছেনা, ওরকম নিম্ন উত্তাপও নয়। ফলে ইতোমধ্যেই তার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়েছে। তার বৈশিষ্টময় আকার ও আচরণের জন্য শ্বেত ভল্লুকের দুর্গতি বেশি মনোযোগ কাড়লেও কীট পতঙ্গ থেকে শুরু করে অনেক প্রাণির ক্ষেত্রেই অনুরূপ দশা ঘটছে।

ইতোমধ্যে আমরা যে বিপুল পরিমাণ গ্রীন হাউস গ্যাস উদ্গীরণ করেছি, এখনো করে চলেছি, এতে অদূর ভবিষ্যতে এর ফল জীববৈচিত্রের উপর আরো ভয়াবহ হবে। মডেলিং এর ভবিষ্যৎদ্বানী থেকে বুঝা যাচ্ছে উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং সমুদ্র জলের প্রকৃতি পরিবর্তনের ফলে অষ্ট্রেলিয়ার গ্রেট বেরিয়ার প্রবাল প্রাচীরের ৯৫% ধ্বংস হবে এর জীববৈচিত্র সমেত। সমুদ্র পৃষ্ঠ উচ্চতার বৃদ্ধিতে দুনিয়ার অধিকাংশ ম্যাংগ্রোভ বনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। গ্রীণ হাউস গ্যাস উদ্গীরনের মাধ্যমে বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ঘটিয়েও আমরা প্রকারান্তে শুধু নিজেদের নয়, পুরো জীববৈচিত্রের ধ্বংস ডেকে আনছি।

জীববৈচিত্র রক্ষায় জীব পরিবেশ গড়া

রক্ষা করার কয়েকটি দিক

জীববৈচিত্র যে আমাদের কারণে দ্রুত অবক্ষয়ের দিকে যাচ্ছে, সেটি থামাতে হলে প্রধান কর্তব্য হলো আমাদের ঐ ক্ষতিকর কাজগুলোকে থামানো, অন্তত তার রাশ টেনে ধরা। নিজেদের অনেক অভ্যাস এজন্য আমাদেরকে বদলাতে হবে। যে কোন মূল্যে নিজেদের সীমাহীন চাহিদাগুলোকে তাৎক্ষণিক পূরণ করতেই হবে এমন গোঁ ধরাটি আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে। নিজেদেরকে ও সারা জীবজগতকে এক সঙ্গে চিন্তা করে সবার দীর্ঘস্থায়ী মঙ্গলের কথা ভেবেই যদি আমরা আমাদের জীবন যাপন, উন্নয়ন ও সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করি তা হলে ঐ বিলুপ্তি প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবো। কিন্তু ইতোমধ্যেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ জীববৈচিত্রে যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে, এবং যাকে আমরা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আরো চরমে নিয়ে গেছি, আজ নিজেরা থেমে গেলেই সেই ক্ষতির চাকা কিন্তু থামবেনা। আমাদের সুবুদ্ধির ভাল ফল পেতে হলে আমরা শুধু ভবিষ্যতে ক্ষতি না করার চেষ্টা নিলেই হবেনা, যে ক্ষতি হয়ে গেছে তার পূরণে উদ্যোগী হয়ে অতিরিক্ত আরো অনেক কিছু করতে হবে। যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে এতদিন আমরা প্রকারান্তে জীববৈচিত্র নষ্ট করার কাজে লাগিয়েছি, তাকেই এখন সেই ক্ষতি পূরণের কাজে ব্যবহার করতে হবে। তাই অনেকগুলো বাস্তব উদ্যোগ নিতে হবে, আর সেগুলো হতে হবে জীববৈচিত্র সম্পর্কে উন্নত গবেষণার মাধ্যমে ক্ষতি পূরণের উপায় ও উপকরণগুলোকে আরো অনেক দক্ষ করে তোলার মাধ্যমে।

উদ্যোগগুলো প্রধানত তিনটি দিক থেকে আসতে পারে। একটি হলো জীবের বসত ও পরিবেশকে (ইকোসিস্টেম) রক্ষা করা। যে ধরনের বসত এলাকা ও পরিবেশের মধ্যে জীববৈচিত্র নির্বিঘ্ন ও টেকসই হতে পারে, সেগুলো আমাদেরকে এখন বিশেষ বিশেষ হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি করে দিতে হবে। দ্বিতীয় দিকটি হবে বিপন্ন জীবের প্রজাতিকে ও সেসব প্রজাতির সদস্য সংখ্যাকে রক্ষা করা। প্রজাতি পর্যায়ে কাজ করে বিপন্ন প্রজাতিগুলোকে যদি যত্নসহকারে রক্ষার উদ্যোগ না নিই, এবং এজন্য তাদের ন্যূনতম সংখ্যা ও ঘনত্ব আবার সৃষ্টি করতে না পারি, তা হলে এদের কোন আশা নাই। আমরা ভবিষ্যতে আমাদের অভ্যাস বদলালেও তা এদের কোন কাজে লাগবেনা, কারণ তার আগেই এরা চিরতরে

বিলুপ্ত হয়ে যাবে। উদ্যোগের তৃতীয় দিকটি হবে জীব জগতের যে ধরনের ব্যবহার আমাদের করতে হয় তার ব্যবস্থাপনায় জীববৈচিত্র সহায়ক পরিবর্তন আনা। বন, কৃষি, মৎস্য সম্পদ এগুলোর ব্যবহার আমাদের জীবন ধারণ ও উন্নয়নের জন্য আবশ্যক। কিন্তু সেগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনাকে এমন টেকসই পর্যায়ে নেয়া যায় যে জীববৈচিত্রের অবক্ষয় না ঘটিয়েও এ ব্যবহার সম্ভব। একমাত্র সে রকম ব্যবহারেরই অধিকার আমাদের রয়েছে, তার অতিরিক্ত নয়। তাই টেকসই ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করাটিই উন্নয়ন এবং জীববৈচিত্র এই উভয়কূল রক্ষার একমাত্র উপায়।

ফিরিয়ে দাও তাদের অরণ্য

যেহেতু জীববৈচিত্রের স্বাভাবিক অনেক বসত আমরা দখল করে ফেলেছি, তাদের জন্য আমাদেরকে বিকল্প বসত করে দিতে হবে, এমন বসত যেখান থেকে তাদেরকে কেউ কখনো উচ্ছেদ করবেনা। সেটি হবে তাদের জন্য 'রিজার্ভ' করা জায়গা, তাদের অভয়ারণ্য। এগুলোকে বলাও হয় রিজার্ভ অর্থাৎ সংরক্ষিত এলাকা। যথাযথ বসত ও ইকোসিস্টেমের ব্যবস্থা করে এরকম অভয়ারণ্যই জীব বৈচিত্র রক্ষার উদ্যোগে বর্তমানে সব চেয়ে জরুরী ব্যবস্থা বলে মনে করা হচ্ছে। এজন্য তাদের জন্য যথেষ্ট জায়গা ছাড়তে হবে। তবে যদি ছোট আকারেও করতে হয় তা হলে আরো অন্যান্য সংরক্ষিত এলাকার সঙ্গে উপযুক্ত করিডর

বন্য ঘোড়ার অভয়ারণ্য

দিয়ে একে যুক্ত রাখতে হবে। সব সময় যথেষ্ট বড় সংরক্ষিত এলাকা করা যায়না বলে করিডর সংযুক্ত বহু ছোট অভয়ারণ্যও ভাল বিকল্প হতে পারে। কিন্তু করিডর সরু জায়গা বলে এখানে জীবের জন্য বিপদ অপেক্ষাকৃত বেশি হতে পারে, নিরাপত্তার অভাব হতে পারে। এ দিকটিও বিবেচনায় রাখতে হয়।

মোটের উপর সংরক্ষিত এলাকা যথেষ্ট বড় হওয়াই উচিত। যত বড় হবে ততই অনেকগুলো সুবিধা এর বাড়বে। যেমন সেক্ষেত্রে নানা জলাশয়, খাল-নদী ইত্যাদি এর মধ্যে থাকার সম্ভাবনা বাড়বে। এগুলো জীবের জন্য সামগ্রিক ভাবে প্রয়োজন– জলজ জীবের জন্য তো বটেই, স্থলের জীবের জন্যও। বড় সংরক্ষিত এলাকায় এমন সব প্রাণিও থাকতে পারবে যাদের যাতায়াতের গণ্ডি অনেক বড় হতে হয়, নইলে তারা টেকসই হতে পারেনা। আবহাওয়ায় পরিবর্তন বা অন্য কোন রকমের বিপর্যয় যখন দেখা দেয় বড় এলাকার জীবরা অত অসহায় হয়না যতটা হয় ছোট এলাকার জীবরা। আয়তনের তুলনায় বড় এলাকার কিনারা অপেক্ষাকৃত কম, অভ্যন্তর অপেক্ষাকৃত বড়। ফলে অভ্যন্তরের জীবগুলো নিরাপদে একান্তে থাকতে পারে– বাইরের ঘাত-প্রতিঘাতে তাদের বিঘ্ন ঘটেনা। তবে ছোট সংরক্ষিত এলাকার গুরুত্বও কম নয়, কারণ সেগুলোই আমরা সর্বত্র অধিক পরিমাণে সৃষ্টি করতে পারি। সব চেয়ে ভাল হয় যদি একটি বড় অঞ্চলে বড় বড় কয়েকটি অভয়ারণ্যের সঙ্গে করিডর দিয়ে যুক্ত ছোট কয়েকটি সংরক্ষিত এলাকাও থাকে এদিক ওদিক। এই ছোটগুলো তখন বড়গুলোতে যাওয়া আসার মধ্যবর্তী 'সরাইখানা' হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। বিভিন্ন দিকে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে এখানকার সকল জীবই স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর জীবন পেতে পারে।

সংরক্ষিত এলাকা গঠনের সময় তার মধ্যে যথেষ্ট বসতবৈচিত্র থাকা ভাল, তাতে জীববৈচিত্রের সুযোগ বাড়ে। শুধু বনভূমি না হয়ে পুকুর-হ্রদ-জলস্রোতসহ খোলা তৃণভূমি, জলা জায়গা, পাহাড় ইত্যাদির সমন্বয় যত হতে পারে তত ভাল। এলাকার কিনারাটিও গুরুত্বপূর্ণ। কিনারা আঁকাবাঁকা না হয়ে যথাসম্ভব মসৃণ

কয়েকটি বেষ্টনীর মধ্যে মূল অভয়ারণ্য

গোলাকৃতি হলে তার দৈর্ঘ কমে, ফলে অবাঞ্ছিত কিনারা-প্রজাতির ভিড় করার সম্ভাবনা কম হয়।

তবে মানুষকে যদি এ এলাকা থেকে একেবারে দূরে রাখতে হয় সেটি বাস্তব-সম্মত হবেনা, কারণ সেরকম অভয়ারণ্য করার জায়গা বেশি মিলবেনা। তার চেয়ে বরং একে এমনভাবে সাজানো যায় যাতে কেন্দ্রে একটি অন্তর্ভূমি (কোর) থাকবে যেখানে মানুষ যাবেনা, দু'একজন গবেষক ছাড়া। এর বাইরে রিং এর মত আকারের এলাকাটি হবে একটি মধ্যবর্তী (বাফার) বেষ্টনী যা কিনা সংরক্ষিত জীবগুলোর দখলে থাকলেও সেখানে প্রকৃতি প্রেমিক পর্যটকরা তাদের বিরক্ত না করে সীমিতভাবে যেতে পারবে। তারা অভয়ারণ্যের শোভা উপভোগ করতে পারবে, জীবগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। তারো বাইরে দ্বিতীয় বাফার বেষ্টনীতে সীমিত লোকালয়, ছোট হোটেল, ক্যাম্পিং, ইত্যাদি গড়ে উঠতে পারে। এখানে সাধারণ ভ্রমণকারীরা আসতে ও থাকতে পারবে, অভয়ারণ্যকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের জীবন জীবিকার সুবিধা হবে। বলা যায় এগুলো একরকম মিশ্র এলাকা। এভাবে করা গেলে লোকালয়ের কাছেই গড়ে উঠতে পারে অনেক সংরক্ষিত এলাকা, যার ফলে এগুলো খুব বিরল জিনিসে পরিণত হবেনা।

সংরক্ষিত এলাকার কিছু উদাহরণ

জাতীয়ভাবে বড় আকারে সংরক্ষিত এলাকা যখন সুন্দর প্রাকৃতিক বৈচিত্রের জায়গাগুলোতে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় তখন এদের অনেকগুলোকে জাতীয় উদ্যান (ন্যাশনাল পার্ক) ঘোষণা করা হয়। এগুলো পর্যটনের সুযোগ করে দেয়। একই সঙ্গে জীববৈচিত্র সংরক্ষণেও ব্যবহৃত হয়। এই দুই উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে সাবধান না হলে সমস্যা সৃষ্টি হয়। যথারীতি মধ্যবর্তী বাফার সৃষ্টি করে পর্যটকদের আর জীবদের বসতের অন্তর্ভূমিকে পৃথক না রাখা গেলে জীববৈচিত্র এখানেও ব্যাহত হতে পারে। পর্যটন উন্নয়ন করতে গিয়ে নানা স্থাপনা, সুযোগ সুবিধা, গাড়ি চলাচল ইত্যাদি জীববৈচিত্রকে বিঘ্নিত করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেখানে জনসংখ্যার তুলনায় ব্যবহার্য ভূমির পরিমাণ কম সেখানে অনেক সময় জাতীয় পার্ক বা অভয়ারণ্য স্থাপন করলে স্থানীয় মানুষ আপত্তি জানায়। এর ফলে তাদের বসত বা জীবিকার অবলম্বন ইত্যাদিতে আঘাত আসতে পারে মনে করে তারা বিরূপ থাকে। এই অসহযোগিতার প্রতিকূল প্রভাব জীববৈচিত্রের উপর পড়ে। কিন্তু অনেক দেশে স্থানীয় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তাদের জীবন জীবিকার সঙ্গে অনুকূল করে যখন অভয়ারণ্য স্থাপন করা হয়, তখন সব দিক থেকে এরা সফল হয়। মধ্য আমেরিকার দেশ কোষ্টারিকায় এর ব্যাপক

উদাহরণ রয়েছে। ১৯৭০ এর দশক থেকে শুরু করে সেখানে জাতীয়ভাবে গড়ে তোলা হয় 'জাতীয় উদ্যান ও সংরক্ষণ এলাকা ব্যবস্থা' নামে একটি বড় উদ্যোগ। ত্রিশ বছরের মধ্যে ছোট বড় অনেকগুলো এরকম উদ্যান ও সংরক্ষিত এলাকা সারা দেশজুড়ে গড়ে উঠেছে– যা দেশের আয়তনের ১২ শতাংশ। এর অর্থ হলো দেশটা স্বপ্রোণোদিত ভাবে নিজের ভূমির একটি বড় অংশ জীববৈচিত্রের সংরক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে। তাতে যে শুধু দীর্ঘ-মেয়াদী জীববৈচিত্র উপকৃত হয়েছে তা নয়, স্বল্প মেয়াদে স্থানীয় অর্থনীতিও যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে। এখন দেশটির দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচিরও এটিই প্রধান কর্মকৌশল। অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে এখানে ইকোট্যুরিজমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। আর দেশটির অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগ এখন আসছে এই ইকোট্যুরিজম থেকে।

মধ্য আমেরিকারই আর একটি ছোট দেশ বেলিজ এদিক থেকে আর এক রকমের উদাহরণ সৃষ্টি করছে। দুনিয়ার অনেক বিরল প্রজাতি এখনো বেলিজে টিকে আছে। এদেরকে টিকিয়ে রাখার জন্য এদেশের নানা স্থানে গড়ে উঠেছে স্থানীয় মানুষদেরকে সঙ্গে নিয়ে নানা ছোট ছোট প্রকল্প। যেমন এমনি একটি প্রকল্প হলো এখানকার বিখ্যাত বিরল বানর হাউলার মান্‌কি রক্ষা করার জন্য। স্থানীয় কৃষকরা এই বানরের জন্য তাদের কৃষি জমির একাংশ ছেড়ে দিয়েছে সেখানে গাছপালা হতে দিয়ে। নদীর ধারে ধারে গড়ে উঠা বনের সঙ্গে কৃষকদের এই বন যুক্ত হয়ে গড়ে উঠেছে হাউলার মানকির নিরবিচ্ছিন্ন সংরক্ষিত এলাকা– প্রায় ৪৭ বর্গ কিলোমিটার। এদের দেখতে প্রতি বছর সমাগম হচ্ছে প্রচুর পর্যটকের। স্থানীয় এই পর্যটন শিল্পটি এখন এখানকার কৃষকদের একটি মৌসুমী কাজ– যাতে প্রচুর বাড়তি আয় তাদের হচ্ছে।

সংরক্ষিত এলাকার বাইরেও জীববৈচিত্রের বসত রক্ষা

জীববৈচিত্রের জন্য যখন সংরক্ষিত এলাকা তৈরি করা হয় তখন সেখানকার পরিবেশে সব কিছু করা হয় ঐ জীবগুলোকে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় রাখতে দিতে। মানুষের নিজের প্রয়োজন সেখানে বড় গুরুত্ব পায়না। এরকম সংরক্ষিত এলাকার কারণে মানুষের বসত এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত হয় বলে এগুলো সর্বত্র বেশি সংখ্যায় স্থাপন করা কঠিন। বনাঞ্চল বা দুর্গম প্রাকৃতিক অঞ্চল যেখানে মানুষের বসতির বা কর্মকাণ্ডের চাপ নাই, সেখানে এটি সহজ। অন্যত্র শুধু বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্যান্য প্রয়োজনের সঙ্গে সমঝোতা করেই এটি সম্ভব।

তাই একই সঙ্গে যা করা উচিত তা হলো আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রার এলাকাগুলোর সঙ্গেও যেখানে যতখানি সম্ভব নানা জীবের ব্যবহারযোগ্য পরিবেশ রেখে দেয়া। মানুষের প্রয়োজন এবং জীববৈচিত্রের প্রয়োজনের মধ্যে সাযুজ্য এনেই এটি করা সম্ভব। কোথাও কোথাও তা সুন্দরভাবে করা হচ্ছেও। যেমন আমাদের নানা বসত এলাকায় ছোট বন সদৃশ বৃক্ষকুঞ্জ গড়ে তুলে এটি সম্ভব। এতে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ স্নিগ্ধ পরিবেশ পাবে। অন্যদিকে বৃক্ষকুঞ্জগুলো করিডর দিয়ে একত্র হলে অনেক রকম প্রাণি তাতে স্বাভাবিক ভাবে বাস করার সুযোগ পাবে। আজকাল কোন কোন আধুনিক স্থপতি সাধারণ ফ্ল্যাট বাড়ির দেয়ালের বাইরেও অল্প খানিক জায়গার মধ্যে অরণ্য সুলভ লতাপাতার গুচ্ছ সৃষ্টি করে তাতে উপযুক্ত জীব সমাবেশ ঘটাচ্ছেন, নান্দনিকতার সঙ্গে জীববৈচিত্র সহায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। বলতে গেলে বসত, অফিস আদালত, কলকারখানা ইত্যাদির এলাকার মধ্যেই সুবিধামত ক্ষুদে সংরক্ষিত এলাকা গড়ে তোলা সম্ভব যেগুলো করিডর দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত থাকবে। এরকম এক একটা কর্ম বা বসত এলাকার চারপাশে সুন্দর সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা যায়, যেমন পারা যায় এদের নানা অংশের ফাঁকে ফাঁকে। রাস্তার বা খালের দুপাশে যদি যথেষ্ট চওড়া বৃক্ষবীথি থাকে তা হলে সেগুলোই করিডরের কাজ করতে পারে অনেক প্রাণির জন্য।

এই প্রক্রিয়ায় কোন আবাসিক এলাকা, শিল্প এলাকা, কোন অফিস কমপ্লেক্স বা অন্য যে কোন ধরনের স্থাপনার পরিকল্পনা যখন করা হয়, তখন তার সঙ্গে জীববৈচিত্র সহায়ক এরকম কিছু কিছু জায়গা সংরক্ষিত করাটি পরিকল্পনার আবশ্যিক অংশ হবে। একই কথা কৃষি ও কৃষিসদৃশ কর্মকাণ্ডের জন্যও প্রযোজ্য হবে। কৃষি জমির ফাঁকে ফাঁকে বৃক্ষবীথির সৃষ্টি করে কৃষি বনায়ন করলে একই সঙ্গে জীববৈচিত্রের এবং কৃষির সঙ্গে বন সম্পদ আহরণের উপায় হতে পারে। এমনকি জমির আইলে ছোট ঝোপসারি সৃষ্টি করলেও জীববৈচিত্রের যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে– এবং অনেক জায়গায় হচ্ছেও। জমির এক অংশকে বছর খানেক পতিত রাখার নিয়মটিও অনেক জায়গায় একই সঙ্গে জীববৈচিত্র ও জমির উর্বরতা রক্ষা উভয় উদ্দেশ্য সাধন করছে।

সংরক্ষিত এলাকাই বলি, বা আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশিয়েই জীবের বসত বলি, অতীতে এরকমটি স্বাভাবিকভাবেই আমাদের চারিদিকে ছিল। তখন গ্রাম গ্রামের মতই সবুজের ও জলাশয়ের স্নিগ্ধতায় ঘেরা ছিল। শহরও যথেষ্ট সবুজ ছিল, এখানেও অনেক ঘরের সঙ্গে বাগান থাকতো। এখন বহুদিন ধরে প্রবণতাটি

চলছে এর উল্টো দিকে। তাই এখন পরিকল্পিতভাবে জীববৈচিত্রের জন্য সেই অনুকূল পরিবেশ আমাদেরকে পুনরুদ্ধার করতে হবে।

বিভিন্ন ধরনের ইকোসিস্টেম রক্ষা

যে সব জীব বনভূমি ধরনের ইকোসিস্টেমের উপর নির্ভরশীল তাদের বিষয়টি যথেষ্ট স্পষ্ট। কিন্তু অন্যান্য ধরনের ইকোসিস্টেমে যথাযথ বসত সংরক্ষণের সমস্যাগুলো আরো বিচিত্র। যেমন তৃণভূমি রক্ষা করতে হলে সেখানে কত তৃণভোজীকে চারণ করতে দেয়া যাবে তার একটি সীমা বজায় রাখা প্রয়োজন। তৃণভূমির বড় নিয়ামক হলো নানা ধরনের ঘাসের শিকড়। এরা মাটিকে ধরে রাখে, পানিকেও ধরে রেখে ধীরে ধীরে গড়াতে দেয়। তৃণভূমি রক্ষায় মাটি অবক্ষয় হবার মত কারণগুলোকে দূর করতে হয়। প্রয়োজনে মাটি ও পানি হারিয়ে না যাবার জন্য দেয়ালের মত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে হয়। এগুলো না করা হলে সংরক্ষিত তৃণভূমিও মরুকরণের কবলে পড়তে পারে। কাছের বনবিনষ্টি হলেও এখানে মরুকরণ দ্রুততর হয়। আসলে তৃণভূমি একবার নষ্ট হলে তা নিজের আরো গুরুতর বিনষ্টির পথ করে দেয়, কারণ অনাবৃত ভূমি ক্ষয় হয় বেশি, তার উষ্ণতাও বাড়ে, এটি সহজে পানি হারিয়েও মরুকরণের দিকে যায়। অনেক জায়গায় নোনা উঠার ফলেও মরুকরণ ঘটে। জীববৈচিত্রের জন্য যথাযথ ইকোসিস্টেম তৈরিতে এসব লক্ষ্য রাখতে হয়।

স্থলভাগের ইকোসিস্টেম রক্ষার তুলনায় সমুদ্রে সংরক্ষিত এলাকা সৃষ্টি করা বেশি কঠিন। খাড়ির কাছের জায়গাগুলোতে যেখানে জীববৈচিত্রের বড় আবাস হতে পারে সেখানেই আমাদের নগর, বন্দর, শিল্প, মাছের আবদ্ধ চাষ, আমাদের চলাচল ইত্যাদি বেশি। তাই সেখানে আলাদা করে জীবরক্ষার জন্য এলাকা সংরক্ষণ কঠিন। খোলা সমুদ্রে বৈচিত্র হ্রাস অবক্ষয় ইত্যাদির কথা তো জানতে পারাই কঠিন। কিন্তু তারপরেও আন্তর্জাতিক ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে খাড়ি অঞ্চলে এবং সমুদ্রের নানা স্থানে এক রকম সংরক্ষণ এলাকা গড়ে তোলা হচ্ছে জলজ জীবকে নিরাপত্তা দেবার জন্য। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদেরকে নিরাপদে রেখে এ অঞ্চলের জলজ জীব অভয়ারণ্যের সুবিধা ভোগ করে। পৃথিবীর সমস্ত প্রবাল অঞ্চলগুলোকে তো একেবারেই আবশ্যকভাবে জলজ জীবের সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে পরিগণিত করা উচিত, অবশ্য সেখানকার মানব বসতির নায্য প্রয়োজনের দিকেও লক্ষ্য রেখে। জলজ প্রাণির সংরক্ষিত এলাকা অনেক গুণে বাড়ানো এখন আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।

বিপর্যয়ের পর ইকোসিস্টেমে পুনর্জাগরণ

বড় কোন বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার পর সে অঞ্চলে জীবের বসত ও ইকোসিস্টেম রক্ষা বিশেষ ভাবে জরুরী হয়ে পড়ে। ও সময় দ্রুত যদি ইকোসিস্টেমকে পুনর্বাসিত করা না যায় তা হলে ওখানকার জীববৈচিত্রে স্থানীয় ভাবে ধস নামে– অনেক প্রজাতি ওখানে বিলুপ্তও হয়ে যেতে পারে। বিপর্যয় দুরকমের হতে পারে– প্রাকৃতিক বিপর্যয় অথবা মানব সৃষ্ট বিপর্যয়। ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক হারে বনের গাছ ক্ষতিগ্রস্থ হলে এটি সেখানকার প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বনের ভেতর রাস্তা নির্মাণ করতে গিয়ে অথবা ব্যাপক বেপরোয়া বন কেটে সাফ করলে যা ঘটে তা ঐ একই ইকোসিস্টেমের মানব সৃষ্ট বিপর্যয়। উভয়ক্ষেত্রে বনে অস্বাভাবিক রকমের বড় বড় ফাঁক সৃষ্টি হয় যার প্রতিক্রিয়া জীববৈচিত্রের উপর মারাত্মক হতে পারে। এ বনকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেবার জন্য তখন দ্রুত অনেক উদ্যোগ নিতে হয়।

অন্য রকম বিপর্যয়ে বন্যার পর জলজ জীববৈচিত্রে প্রচুর সমস্যা দেখা দেয়। তখন দিঘী বা জলাভূমিগুলোকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে হয়, নানা প্রজাতিকে তাদের স্বস্থানে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। বন্যার ফলে তাদের পুরো খাদ্য জালে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাকেও পুনরুদ্ধার করতে হয়।

স্থলের ইকোসিস্টেমে আর এক ধরনের মানব সৃষ্ট বিপর্যয় ঘটে উন্মুক্ত খনির কাজের ফলে। খনির জন্য যে জায়গা উন্মুক্ত করা হলো সে জায়গার জীব পরিবেশ তো একেবারেই ধ্বংস হয়ে গেলো। তার মাটি যেখানে ফেলা হলো, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য স্থাপনা যেখানে প্রতিস্থাপিত হলো, খনি থেকে তোলা আকরিক যেখানে স্তুপ করা হলো, এগুলো স্থানান্তরের জন্য রাস্তা, রেল ইত্যাদি যেখানে বসলো, সব মিলে আরো বিস্তীর্ণ এলাকায় জীব পরিবেশ প্রায় পুরাপুরিই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যতদিন খনির কাজ চলে একে পুনরুদ্ধারের কোন আশা নাই। তারপর কাজ শেষ হলে আবার সযত্নে এটি ভরাট করতে হয়। অতিরিক্ত স্থাপনা সরিয়ে ফেলতে হয়, উপরে আবার ভূমির উর্বরতা ফিরিয়ে এনে বনায়ন ইত্যাদি করতে হয়। তারপরেই এক পর্যায়ে গিয়ে আগেকার জীবগুলোর স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসলেও আসতে পারে।

জলাভূমিতে, হ্রদে, নদীতে, সাগরে মানব সৃষ্ট বিপর্যয় দেখা যেতে পারে উর্বর জলাশয় মজে গিয়ে, স্রোত বন্ধ হয়ে, বড় ধরনের দূষণ ঘটে, সমুদ্র উপকূলে তেল দূষণ এগিয়ে এসে– ইত্যাদি নানা ভাবে। এদের প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন প্রতিকার রয়েছে যার কোনটি তেমন সহজ নয়। ঐ প্রতিকার করার মাধ্যমেই আবার জলজ জীববৈচিত্রের জন্য ইকোসিস্টেমগুলোকে পুনরুদ্ধার করতে হয়।

আর কতগুলো বিপর্যয়কে আমরা বিপর্যয় বলেই চিনতে পারিনা অনেক সময়। বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় এমনটি ঘটে। যেমন বাঁধ নির্মাণ, দীর্ঘ বড় সেতু নির্মান, নদী শাসন, ব্যাপক রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদির ফলে বিশাল এলাকার জীবপরিবেশ বিপর্যস্থ হয়। নির্মাণের পর বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে সেখানকার পরিবেশ যথাসম্ভব পূর্বাবস্থায় আনতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজটি এমন স্থায়ী ভাবে একে পরিবর্তন করে দেয় যে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত হস্তক্ষেপ ছাড়া পুনর্বাসন আদৌ সম্ভব হয়না। যেমন বেড়ি বাঁধ নির্মাণের ফলে বা রাস্তা নির্মাণের ফলে পানির আসা যাওয়া বাধা পেয়েই অনেক অনর্থ ঘটতে পারে। আজকাল নিয়ম হচ্ছে বড় ধরনের নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা নেবার সময় শুধু সার্বিকভাবে পরিবেশের নয়, বিশেষ ভাবে জীববৈচিত্রের ইকোসিষ্টেমের পুনর্বাসনের ব্যাপারটিও এই পরিকল্পনায় রাখতে হয়। যেমন আমাদের দেশে কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনায় স্থানীয় মানুষের গুরুতর ক্ষতির দিকে যেমন লক্ষ্য রাখা হয়নি, তেমনি জীববৈচিত্রের ইকোসিষ্টেম পুনর্বাসনের কোন উদ্যোগ ছিলনা। তাই সেখানে অনেক অপূরণীয় ক্ষতি সেদিন হয়ে গেছে জীববৈচিত্রের দিক থেকেও। কিন্তু যমুনাতে যখন সেতু নির্মাণ করা হয়েছে তখন এই দিকটা মনে রাখার চেষ্টা হয়েছে, তাতে ক্ষতিটি বেশ খানিকটা পুষিয়ে নেয়া গেছে। এমনকি বিষয়টির গুরুত্ব সবার কাছে আনার জন্য স্থানীয় জীববৈচিত্রের একটি চমৎকার জাদুঘরও সেখানে গড়ে তোলা হয়েছে।

বিপন্ন প্রজাতির লালন পালন

কাকে বাঁচাব, কোথায় বাঁচাব

জীববৈচিত্রের জন্য নিরাপদ বসতের ব্যবস্থা করে দিলেই সব প্রজাতিকে বাঁচানো যাবেনা। অনেকের জন্যই এটি দেরি হয়ে গেছে। এই প্রজাতিগুলোর এখন শেষ দশা, সারা দুনিয়ায় মিলে পুরো প্রজাতির স্বল্প সংখ্যক সদস্যে এসে ঠেকেছে। একেবারে বিচ্ছিন্ন দু'একটি দলে হয়তো এরা এখনো নিভু নিভু ভাবে রয়েছে যার প্রত্যেকটির সদস্য সংখ্যা হাতে গুণা যায়। এমন অবস্থায় বন্য স্বাভাবিক ইকোসিষ্টেমে তাদের কোন ভবিষ্যৎ নাই। এভাবে সময় গড়াতে থাকলে এ প্রজাতির বিলুপ্তি অনিবার্য। বাঁচাবার একমাত্র উপায় হলো বিশেষ ব্যবস্থায় সযত্নে লালন পালন করে প্রজাতিটির ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য ন্যূনতম সংখ্যা গড়ে তোলা। তখন এগুলোকে অনুকূল ইকোসিষ্টেমে আবার ছেড়ে দিয়ে আশা করা যায় যে তাদের সংখ্যা বংশ পরম্পরায় ওখানে বেড়ে আবার স্বাভাবিকের দিকে যাবে। এটি জীববৈচিত্র রক্ষার উদ্যোগে আরেকটি দিক।

সমস্যা হলো এভাবে হাতে ধরে যত্ন করে এক একটি প্রজাতির এক একটি সদস্যকে লালন পালন সোজা কাজ নয়। যে অসংখ্য প্রজাতি ক্রমাগত বিপন্ন হচ্ছে তাদের ক'টিকেই বা এভাবে বাঁচানো যাবে? এক্ষেত্রে আমাদেরকে অগ্রাধিকার ঠিক করতে হয় কাকে বাঁচাবো। অগ্রাধিকারটি ঠিক করতে হবে কয়েকটি বিষয়ের বিবেচনায়। প্রথমত এর সফল হবার সম্ভাবনা কতখানি? আবার স্বাধীন ভাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার মত অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যাদের বেশি থাকবে সেগুলোর দিকেই দৃষ্টি দেয়া উচিত। আর একটি বিবেচ্য হলো নিজের ইকোসিষ্টেমের মধ্যে এই প্রজাতির জীব-পারিবেশিক মূল্য কত বেশি তা। যে প্রজাতিটি থাকা না থাকার উপর আরো অন্য অনেকগুলোর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে সেটি বেশি গুরুত্ব পাবে। এটি যদি কী-ষ্টোন প্রজাতি হয় তা হলে তো কথাই নাই। তাদের মধ্যে যদি আরো বাছাই করতে হয় তা হলেই শুধু দেখতে হবে অর্থনৈতিক ভাবে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জীবপারিবেশিক মূল্যের অগ্রগণ্যতাটি অবশ্যই অর্থনৈতিক মূল্যের চেয়ে বেশি।

কাকে বাঁচাব ঠিক করার পর সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোথায় তাকে বাঁচানো যাবে। ভাল হয় যদি তার স্বাভাবিক বন্য পরিবেশে রেখেই তাকে লালন পালন করা যায়। যদি সেটি না হয় তা হলে এদের আনতে হবে আমাদের নিজেদের

আয়োজিত কোন আবাসে– চিড়িয়াখানায়, এক্যুরিয়ামে, তত্ত্বাবধানে রাখা প্রজনন কর্মসূচিতে (ক্যাপটিভ ব্রিডিং প্রোগ্রাম), বোটানিক্যাল গার্ডেনে বা এমনি কোন ব্যবস্থায়। অবশ্য বুঝাই যাচ্ছে যে এক্ষেত্রে এসব জায়গায় রাখার উদ্দেশ্য আগ্রহী দর্শকদেরকে দেখানো নয়, বরং প্রজাতির এই বিরল সদস্যদের যত্ন নেয়া এবং তার বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

জীবের নিজের পরিবেশে রেখে লালন পালন

বিরল প্রজাতিকে বাঁচাবার জন্য লালন পালন পরিকল্পনায় এর সম্পর্কে বেশ কিছু গবেষণার প্রয়োজন হয়। গবেষণার একটি প্রশ্ন হলো এই জীবের একটি টেকসই দলের জন্য ন্যূনতম কতগুলো সদস্য প্রয়োজন হবে? এটি জানলে এই সংখ্যার দিকেই লক্ষ্যটি স্থির করতে হবে। কারণ এরকম আয়োজনে প্রয়োজনের বেশি অনেক সংখ্যক সদস্য পালন করার চেষ্টা করা উচিত নয়, কারণ এটি ব্যয়বহুল। যে জায়গায় রেখে এটি করা হবে সেখানে স্থান আর সুযোগ সুবিধার সীমাবদ্ধতা থাকাটা স্বাভাবিক। কম্পিউটার মডেলিং এর মাধ্যমে এক একটি ক্ষেত্রে প্রজাতিকে বাঁচানোর জন্য নূন্যতম প্রয়োজনীয় সংখ্যাটি জেনে নেয়া সম্ভব। পি ডি এ (পপ্যুলেশন ভেরিয়েবিলিটি এ্যানালাইসিস) নামের একটি মডেলিং সফ্টওয়্যার ব্যবস্থা রয়েছে এর জন্য। এর মাধ্যমে বিভিন্ন সদস্য সংখ্যার দলে জীবটির ঝুঁকি, লালন পালনের স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি জানা সম্ভব প্রয়োজনীয় উপাত্তের সহায়তায়। লালন পালনের দুটি উদ্দেশ্যের কথা এর মধ্যে মনে রাখা হয়। স্বল্পমেয়াদী উদ্দেশ্যটি হলো আপাতত বিলুপ্ত হবার হাত থেকে রক্ষা করা। আর দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্যটি হলো এটি যেন আবার স্বাভাবিক বন্য পরিবেশে ফিরে গিয়ে স্বাধীনভাবে বাস করতে পারে, প্রজনন করতে পারে এবং বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

প্রজাতিটির নিজ পরিবেশে লালন পালন করার জন্য দরকার সংরক্ষিত আশ্রয় এলাকা। যে ক'টি প্রজাতির লালন পালনের ব্যবস্থা এখানে থাকবে তাদের প্রত্যেকটির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানি, ছায়া, বসত বাসা, চারণ, প্রজনন সুযোগ সব কিছুর ব্যবস্থা থাকতে হবে। একই সঙ্গে সেখানে নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করতে হবে– সম্ভাব্য প্রাকৃতিক শিকারি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিশেষ যত্নগুলো নিতে হবে। যেমন জলজ প্রাণি হলে সঠিক স্রোত ইত্যাদির ব্যবস্থা, পাখি হলে উপযুক্ত বাসা করে দেয়া, কুমির বা কাছিমের মত প্রাণি হলে মাটিতে গর্তে পাড়া তাদের ডিমের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি। যে সব প্রজাতির প্রজননে অনীহা বা বিরল প্রজনন, তাদেরকে প্রজননের সুযোগ

করে দিতে হয়। পরজীবি, রোগজীবাণু ইত্যাদির আক্রমণ যেন না ঘটে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়। বাচ্চা এলে সেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সর্বোতভাবে চেষ্টা করতে হয়। বন্য পরিবেশে রেখে এত কিছু করা খুব দুরূহ ব্যাপার। তবুও যথাসাধ্য করতে হয়। দুনিয়ার বহু দেশে বহু সফল প্রকল্পে এমনিভাবে সযত্নে বাঁচানো হচ্ছে অনেক প্রজাতিকে। অনেকগুলো প্রজাতি নিশ্চিত বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এমনি উদ্যোগের ফলে– তা সেটি আমেরিকার কালিফোর্নিয়া কন্ডোর পাখিই হোক কিংবা ভিয়েৎনামের কাও-ভিট উল্লুকই হোক। সুপরিকল্পিত এরকম লালনের ব্যবস্থায় বনে একটি নূতন বাচ্চার জন্মও সেখানে একটি বিরাট খবর, বিরাট খুশির খবর। কাও-ভিট উল্লুকের কথাই বলি। চীন-ভিয়েৎনাম সীমান্ত অঞ্চলের জঙ্গলে বিলুপ্তির পথে এই প্রাণিটির এক শ'য়ের কিছু বেশি সংখ্যা এখনো টিকে আছে। ওখানে একটি নূতন শিশুর জন্ম তাই আশার আনন্দ আনে। শিশুটিকে বাঁচাবার জন্য চলে অনেক মানুষের প্রাণান্ত চেষ্টা।

প্রজাতিগুলোর নিজ স্থানে রেখেই তাদের এরকম লালন পালনের ব্যবস্থা করা কঠিন হলেও ওভাবে করার কিছু কারণ আছে। সে রকম পরিবেশে যথেষ্ট সংখ্যক সদস্যদেরকে এক সঙ্গে লালন করা যায়। বেশ কিছু প্রজাতিকেও এক সঙ্গে যত্ন করা যায়। তাদের জন্য অনেক ব্যবস্থা যৌথভাবে নিলেও চলে। ফলে লালন করার মত এক একটি প্রজাতির সদস্য সংখ্যা বাড়লেও সেই অনুপাতে তাদের পেছনে ব্যয় বাড়েনা। যদি চিড়িয়াখানায় মানুষের আশ্রয়ে এনে তা করতে হতো তা হলে সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় অনুপাতিক হারে বেড়ে যেত। খাদ্য ও অন্যান্য খাতে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের যে সুযোগ সংরক্ষিত বন্য পরিবেশে থাকে চিড়িয়াখানায় তাও থাকেনা। চিড়িয়াখানা বা এক্যুরিয়ামের মত জায়গায় জন সমক্ষে দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপালনের কাজটি করার একটি সুবিধা অবশ্য আছে। কিন্তু তা বড় দর্শনীয় প্রাণির ক্ষেত্রেই শুধু প্রযোজ্য, পোকা মাকড় সহ ছোট খাট প্রাণির জন্য জনসাধারণের তেমন আগ্রহ নাই।

চিড়িয়াখানার অবদান

নিজস্ব তৈরি কৃত্রিম বসতের মধ্যে নিজেদের যত্নে পশু পাখি রাখার ব্যবস্থা আমরা সব চেয়ে বেশি দেখি চিড়িয়াখানার মধ্যে। চিড়িয়াখানার প্রতি মানুষের প্রবল আগ্রহ রয়েছে, কারণ এখানে সাধারণ মানুষ এবং বিশেষ করে বাচ্চা ছেলে মেয়েরা অল্প আয়াসে কাছের-দূরের সব রকমের পশুপাখির সান্নিধ্যে উপভোগ করতে পারে। প্রধানত মানুষের এই চাহিদা মিটাতেই পৃথিবীর সব বড় বড় নগরে

তো বটেই অনেক সাধারণ শহর বা লোকালয়েও ছোট বড় নানা চিড়িয়াখানা রয়েছে। মানুষের আগ্রহ মেটানো ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চিড়িয়াখানাগুলো আর একটি বড় দায়িত্ব একই সঙ্গে পালন করে, তা হলো দুনিয়ার অনেক ক্ষীয়মান প্রজাতিকে সযত্ন আশ্রয় দিয়ে তাদের সুরক্ষায় সহায়তা দেয়া। সাম্প্রতিক এক হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর সব চিড়িয়াখানায় মোটের উপর ৩০০০ প্রজাতির প্রায় ৭ লক্ষ পশুপাখি রক্ষিত আছে। বুঝাই যায় যে এগুলোর প্রায় সবই বড় ও চোখে পড়ার মত প্রাণি যারা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। তাদের অধিকাংশই বন্য অবস্থায় যথেষ্ট পাওয়া যায়, সেখান থেকেই মাঝে মাঝে ধরে এনে এদের চিড়িয়াখানায় রাখা হয়। এর একটি কূফল কোন কোন ক্ষেত্রে হয় যখন নিজ আবাসে নানা কারণে কমে যাওয়া প্রাণিকে অবৈধভাবে ধরে আনা হয়। এগুলো উচ্চমূল্যে কোন কোন চিড়িয়াখানায় বিক্রয় করা যায় বলে তাদের চোরাচালান উৎসাহিত হয়। এতে নিজ আবাসে প্রাণিটির অবস্থার আরো অবনতি হয়।

অবশ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে চিড়িয়াখানার ইতিবাচক ভূমিকাই বড়। প্রথমত এটি বিরল প্রাণিদের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও মমত্ব তৈরি করে, সেগুলোর সংরক্ষণের প্রতি জন সমর্থন সৃষ্টি করতে সহায়তা করে। তা ছাড়া চিড়িয়াখানার একটি বড় অবদান হলো বিপন্ন কিছু কিছু প্রাণি যেগুলো বন্য অবস্থায় টিকতে পারছেনা সেগুলোকে এখানে রেখে তাদেরকে কিছু বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে টিকিয়ে রাখা। এভাবে বিলুপ্তিকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে , আরো ভাল ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত। এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে চিড়িয়াখানায় থাকা স্তন্যপায়ীদের মধ্যে ২৭৪ টির মত প্রজাতি রয়েছে যেগুলো সত্যিই বিরল, কোনকোনটি রীতিমত বিপন্ন প্রজাতি। অবশ্য এদের সব ক'টিকেই শুধু অভ্যন্তরে বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে চিড়িয়াখানায় টিকিয়ে রাখা যাচ্ছেনা, বিরল বন্য বংশ বৃদ্ধি থেকে এনেও এখানে যোগ করতে হচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যে অন্তত ৯৬টি স্তন্যপায়ী প্রজাতি রয়েছে যেগুলো শুধু চিড়িয়াখানায় বংশবৃদ্ধির উপরেই টিকে আছে।

চিড়িয়াখানা আজ শুধু প্রদর্শনের একটি জায়গা নয়, গবেষণা ও বিরল প্রজাতির লালন পালন ও প্রজনন পৃথিবীর বহু গুরুত্বপূর্ণ চিড়িয়াখানার একটি বড় দায়িত্ব। অবশ্য এই প্রজননের দায়িত্বটি যেখানে খুবই সূক্ষ্ম ও বিশেষায়িত প্রকল্পে পরিণত হয় তখন এর জন্য তত্ত্বাবধানে রাখা প্রজনন কর্মসূচি (ক্যাপটিভ ব্রিডিং) নিতে হয়– তা চিড়িয়াখানায় হতে পারে, আলাদা ব্যবস্থায়ও হতে পারে।

জরুরী প্রজনন কর্মসূচিগুলো

মানব প্রযত্নে বিরল প্রাণি প্রজনন

প্রজনন কর্মসূচিগুলোতে প্রজনন সম্পর্কে আধুনিক বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিগুলোর সব সুযোগ নেয়া হয়। সনাতন ভাবে পরিচিত কৌশলগুলোর কথা যদি বলি– যে পাখি এখন ডিমে তা ঠিকমত দিচ্ছেনা তাদের ডিম তার সদৃশ অন্য পাখির সাহায্যে অথবা কৃত্রিম ডিম ফুটাবার যন্ত্রের সাহায্যে ফুটানো হয়। যে স্তন্যপায়ী প্রাণি গর্ভ ধারন করতে পারছেনা তার ভ্রূণ ঐ প্রজাতিরই আর কোন জাতের সদস্যের গর্ভে স্থানান্তর করে বংশবৃদ্ধির চেষ্টা হচ্ছে। যেখানে যৌন মিলনে অনীহা দেখা যাচ্ছে– সেখানে কৃত্রিমভাবে শুক্র কোষ স্ত্রী জনন অঙ্গে প্রবিষ্ট করার ব্যবস্থা হচ্ছে। আধুনিক টেষ্ট টিউব বেবীর যে প্রযুক্তিগুলো রয়েছে প্রয়োজনে সেগুলোর সাহায্যও নেয়া হচ্ছে। এই শেষোক্তগুলো জটিল ও ব্যয় বহুল প্রক্রিয়া, সাফল্যের হারও সব ক্ষেত্রে এক রকম নয়। তবুও এর সবই প্রয়োগ করতে কার্পণ্য করা হচ্ছেনা।

সব সময় সব কিছু যে একেবারে ঘরের মধ্যে হচ্ছে তাও নয়। অনেক জায়গায় সংরক্ষিত এলাকা সৃষ্টি করে প্রাকৃতিক পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়েই তা করা হচ্ছে। মালয়েশিয়ার ওরাং ওটাংদের কথা ধরা যাক। সেখানে বিস্তীর্ণ বাদল বনকে অর্থনৈতিক কারণে পাম গাছের বাগানে পরিণত করা হয়েছে। ফলে ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এখানকার বিপন্ন প্রাণি মানুষের খুব সদৃশ এইপ্ ওরাং ওটাং

বাদলবনের অসহায় ওরাং ওটাং

বারবারি সিংহ প্রকল্প

(স্থানীয় ভাষায় এর নামের অর্থ 'বনের মানুষ')। সম্প্রতি এ সম্পর্কে সচেতনতা ও উদ্যোগের সৃষ্টি হলে কতগুলো কাজ করা হচ্ছে। ঐ পাম বাগানগুলোর নানা অংশেই সৃষ্টি করা হয়েছে ওরাং ওটাং এর জন্য সংরক্ষিত বন, যেগুলো পরস্পর সংযুক্ত এবং প্রাণিটি ওসবের মধ্য দিয়ে অবাধে বিচরণ করতে পারছে। একদিকে ওরাং ওটাং এর বংশবৃদ্ধি এখন খুবই স্তিমিত। অন্যদিকে বন বিনষ্টির ও প্রাণি বিনষ্টির ফলে এদের অনেক শিশু খুবই অসহায়। এজন্য এদের প্রজনন ও লালন পালনের জন্য এতিম শিশু প্রাণিগুলোকে আদর যত্নে বড় করে তোলার জন্য প্রকল্প ওখানে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকল্পের ঘরোয়া পরিবেশে এক সময় ওরা পূর্ণ বয়স্ক ও সক্ষম হবার পর তাদেরকে সংরক্ষিত বনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে আত্মনির্ভর হয়ে চলার জন্য।

এ ধরনের প্রজনন প্রকল্পের পেছনে কয়েক রকম লক্ষ্য থাকে। বনে যে প্রজাতির সদস্য সংখ্যা খুব কমে গেছে, তাদেরকে আবার টিকে থাকার মত ন্যূনতম সংখ্যায় নিয়ে আসা একটি লক্ষ্য হতে পারে। একটি বিশেষ অঞ্চলে এক সময় প্রাণিটির যথেষ্ট সদস্য ছিল এখন এলাকাটি ঐ প্রাণিশূণ্য হয়ে গেছে। এখানে আবার একে ফিরিয়ে আনতে হবে– সেটিও একটি উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার আগে কখনো এই এলাকায় প্রাণিটি ছিলনা, নূতন করে এখানে আনতে চাই– সার্বিকভাবে একে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য– এমনো হতে পারে। আবার এমনো দেখা গেছে অতীতে একটি জায়গায় প্রচুর ছিল, এখন প্রজাতিটিই বিলুপ্ত।

এখন তার কাছাকাছি বেঁচে থাকা প্রজাতি ওখানে আবার এনে বাড়তে দিয়ে সেই ঐতিহাসিক পরিস্থিতি কিছুটা সৃষ্টি করা যায়। যেমন আমেরিকান বাইসনের একটি উপ-প্রজাতি উড বাইসনের বর্তমান আবাস কানাডায়। সেখান থেকে এনে একে রাশিয়ার বিস্তীর্ণ সংরক্ষিত তৃণভূমিতে ছাড়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে, কারণ এই এলাকায় গত বরফ যুগের শেষ পর্যন্ত ষ্টেপ বাইসন নামে কাছাকাছি আর একটি বাইসন প্রজাতি ভাল ভাবেই ছিল, যা তখনই পরে বিলুপ্ত হয়েছে।

অনেক প্রজনন কর্মসূচির পেছনে এরকম ঐতিহাসিক কারণ থাকে। এমন আর একটি উদাহরণ হলো উত্তর আফ্রিকার বারবারি সিংহ রক্ষার জন্য সাম্প্রতিক নেয়া একটি প্রকল্প। বারবারি সিংহ হলো সিংহের একটি উপ-প্রজাতি যেগুলো উত্তর আফ্রিকার বাসিন্দা ছিল। এখনকার মরক্কো, তিউনেশিয়া, আলজেরিয়া ও মিশরের এটলাস পার্বত্য অঞ্চলে হাজার হাজার বছর ধরে এরা বিচরণ করতো। এদের বিশেষ বৈশিষ্ট হলো পুরুষদের লম্বা কালো কেশর এবং অন্যান্য সিংহের চেয়ে তুলনায় ভারী দেহ। রোমান গ্লাডিয়েটরদেরকে যে সব সিংহের সঙ্গে সামনাসামনি লড়তে বাধ্য করা হতো সেগুলো ছিল উত্তর আফ্রিকা থেকে আনা এই সিংহ। গত কয়েকশত বছর ধরে কমতে কমতে এখন এই সিংহ বন্য অবস্থায় আর নাই। গত শতাব্দীতেই এটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেত যদি না এর কয়েকটি মাত্র নমুনা কিছু চিড়িয়াখানায় এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহে থেকে না যেত। কিন্তু সেভাবে থাকা সিংহসমূহের অনেকগুলোর বিশুদ্ধতা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। বারবারি উপ-প্রজাতির না হয়েও কোন কোন সিংহের কালো কেশর থাকতে পারে। তাছাড়া এদের কোন কোনটির মধ্যে অন্য সাধারণ উপ-প্রজাতির সঙ্গে মিশ্র প্রজননেরও সম্ভাবনা রয়েছে। বন্দী অবস্থায় কিছু বিশুদ্ধ বারবারি সিংহ এখনো টিকে থাকার সুযোগ নিয়ে ইতোমধ্যে একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে যাতে

ক্যাপটিভ ব্রিডিং এর সাফল্য: গোল্ডেন লায়ন টামারিন

এদের থেকে সযত্ন প্রজনন ঘটিয়ে বারবারি সিংহের বংশবৃদ্ধি ঘটানো যায় এবং আবার তাকে তার অতীত অঞ্চলে অর্থাৎ এটলাস পার্বত্য অঞ্চলে বন্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, ভবিষ্যতে টেকসই হবার জন্য। এজন্য এখন প্রজননের জন্য এই উপ-প্রজাতির বিশুদ্ধ সদস্যগুলোকে খুঁজে বের করতে ডিএনএ পরীক্ষার আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। বিভিন্ন মিউজিয়ামে থাকা নিশ্চিত বারবারি সিংহের কঙ্কাল থেকে ডিএনএ নিয়ে তার জেনেটিক বৈশিষ্টসমূহ চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং তার নিরিখে বারবারি বলে কথিত জীবন্ত সিংহগুলোকে পরীক্ষা করা হচ্ছে এদের মধ্যে কোন্‌গুলো বিশুদ্ধভাবে বারবারি তা নির্ণয়ের জন্য। এভাবেই শুরু হয়েছে তাদের নিয়ে প্রজনন কর্মসূচি।

শুধুমাত্র প্রজনন কর্মসূচির কারণে বিলুপ্তপ্রায় প্রাণি এখন ঘুরে দাঁড়ানোর মত একটি সংখ্যায় দাঁড়িয়ে যেতে পেরেছে এমন উদাহরণ যথেষ্ট রয়েছে। যেমন দক্ষিণ আরবের মরু অঞ্চলে এক সময় এক ধরনের মরু-হরিণ এরাবিয়ান অরিক্স যথেষ্ট ছিল। সাদাদেহী, খাড়া শিংওয়ালা এই বৈশিষ্টময় হরিণ জাতীয় প্রাণি চামড়া, মাংস ইত্যাদির কারণে ১৯৫০ এর দশকের পর পর ব্যাপক ভাবে শিকার করা হয়, এবং ১৯৭০ এর দশকে বন্য অবস্থায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে ইতোমধ্যে চিড়িয়াখানায় থাকা সদস্য থেকে প্রজনন করিয়ে ওমানের সংরক্ষিত মরুতে আবার বন্য ভাবে ছেড়ে দেয়া গেছে শতাধিক এরাবিয়ান অরিক্স। এখন এগুলো সেখানে বেড়ে উঠতে পারছে। মানুষের প্রযত্নে সংরক্ষিত আছে এদের পাঁচ শতাধিক সদস্য। ব্রাজিলের আমাজন বনের খুব ছোট্ট বানর গোল্ডেন লায়ন টামারিন। উজ্জ্বল সোনালী রঙের ও সিংহের মত কেশর থাকার কারণে এই নাম। এর বসত অঞ্চলে ব্যাপক বনবিনষ্টির ফলে ও নানা সংগ্রহের জন্য অধিক সংখ্যায় ধরার ফলে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে এর সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে কমে যায়। ১৯৮০ এর দশকে গিয়ে এগুলো এক শ'টিরও কম ছিল বলে মনে করা হয়। বিলুপ্তির কিনারায় চলে যাওয়া এই সুন্দর প্রজাতিটিকে প্রজনন কর্মসূচির মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি করে আবার আমাজনের বনে ছাড়া হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে বন্য অবস্থায় এদের সংখ্যা

ক্যাপটিভ ব্রিডিং এর সাফল্যঃ এরাবিয়ান ওরিক্স

এক হাজারের উপরে চলে গেছে। তা ছাড়া বন্য অবস্থায় এদের বংশ বৃদ্ধির হার চিড়িয়াখানায় থাকাগুলোর থেকে অধিক দেখা যাচ্ছে। এর অর্থ হলো খুব সম্ভব এই প্রাণিটি বিলুপ্তির বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারছে। প্রজনন কর্মসূচির কারণে টিকে গেছে এরকম আরো বেশ কিছু প্রজাতি রয়েছে, যদিও সব ক্ষেত্রে প্রচেষ্টাগুলো একই ভাবে সফল হচ্ছেনা।

এক্যুরিয়াম, বোটানিক্যাল গার্ডেন

প্রাণির লালন পালনে চিড়িয়াখানার মত এক্যুরিয়ামেরও একটি ভূমিকা রয়েছে। পৃথিবীতে এখন বহু বড় বড় এক্যুরিয়াম রয়েছে যারা বৃহদাকার আয়োজনের মাধ্যমে মানুষকে সামুদ্রিক ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণির সঙ্গে পরিচিত হতে, এর সৌন্দর্য উপভোগ করতে সুযোগ দিচ্ছে। একই সঙ্গে তাদের কোন কোনটি বিপন্ন নানা জলজ প্রাণির সংরক্ষণ, প্রজনন, গবেষণা ইত্যাদির কাজও করছে। উদাহরণ স্বরূপ সামুদ্রিক উদের উপর কাজের কথা বলা যেতে পারে। নানা কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিটি সমুদ্রে ক্রমেই বিরল হয়ে উঠছে। অথচ এটি একটি কী-ষ্টোন প্রজাতি যার অভাবে সমুদ্রতলে কোন কোন তৃণভোজির দৌরাত্ম এত বেড়ে যাচ্ছে যে সেখানকার উদ্ভিদবৈচিত্র হুমকিতে পড়ছে। কয়েকটি এক্যুরিয়াম বিপন্ন এই প্রজাতির প্রজনন ও সংরক্ষণের মাধ্যমে এই অবস্থার পরিবর্তন সূচনা করার উদ্যোগ নিয়েছে।

উদ্ভিদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখছে বোটানিক্যাল গার্ডেনগুলো। বিশ্ববিখ্যাত অনেক বোটানিক্যাল গার্ডেন এখন কিংবদন্তীতুল্য। তাছাড়া সাধারণভাবেও দুনিয়ার নানা জায়গায় স্থানীয় বিরল উদ্ভিদগুলোকে একমাত্র সেখানকার বোটানিক্যাল গার্ডেনগুলোতেই দেখা সম্ভব। যত্নশীল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এরা উদ্ভিদবৈচিত্রকে ধরে রাখছে যা না হলে এর অনেকগুলোই বিলুপ্ত হয়ে যেতো। শীতের দেশের বোটানিক্যাল গার্ডেনে উষ্ণ মণ্ডলীয় বৃক্ষ সংরক্ষণের জন্য বিশাল গ্রীন হাউসে সঠিক উষ্ণতা, আর্দ্রতা ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। বোটানিক্যাল গার্ডেনে সাধারণত একই উদ্ভিদের বেশ কিছু নমুনা রাখা হয় এবং তাদের বিভিন্ন জাতকে আলাদা ভাবে সংরক্ষণ করা হয়। পুরানো উদ্ভিদের পাশাপাশি এতে নূতন করে চারিয়ে বংশবৃদ্ধিরও ব্যবস্থা থাকে। এটি বীজ থেকে যেমন করা হয় তেমনি অঙ্গজ বংশবৃদ্ধির মাধ্যমেও করা হয়। এভাবে সক্রিয় বোটানিক্যাল গার্ডেনগুলো অপেক্ষাকৃত সহজে দুনিয়ার উদ্ভিদ সম্পদগুলো রক্ষা করতে পারছে, যা পরে প্রয়োজন মত বনভূমি বা বন্য পরিবেশের পুনর্বাসনে ব্যবহার করা সম্ভব।

কৌলিক সম্পদ রক্ষাঃ বীজ ব্যাংক

জীববৈচিত্রকে বজায় রেখে ভবিষ্যতে তার সমৃদ্ধ কৌলিক সম্পদের আরো মূল্যবান ব্যবহার করতে হলে সেই বৈচিত্রকে কোন না কোন ভাবে ধরে রাখতে হবে। বাইরের বাস্তবতায় যখন এর নানা প্রজাতি, নানা জাত হুমকির মুখে পড়ছে, তখন একে বাঁচাবার উদ্যোগগুলো নেবার জন্য তার মূল কৌলিক উপাদানকে খুঁজে পেতে হবে। এজন্যই এদের সংরক্ষণ জরুরী। প্রাণির ক্ষেত্রে পুরো প্রাণিটিকেই সংরক্ষণ করতে হয় এবং তার কিছু কিছু ব্যবস্থা আমরা দেখেছি। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে উদ্ভিদ হিসাবে তো সংরক্ষণ করা যায়ই (বোটানিক্যাল গার্ডেনে যা করা হয়) তাছাড়া বীজব্যাংকের আকারে আরো অল্প জায়গায় এই দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ সম্ভব। উভয় প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ কৌলিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ রয়েছে। এতে আনুসঙ্গিক বিভিন্ন দেশের সহযোগিতায় বীজ বা চারা সংগ্রহ করতে হয়, সেগুলো উপযুক্ত পরিবেশে সংরক্ষণ করতে হয়, এবং প্রয়োজন মত মাঝে মাঝে অঙ্কুরিত করে নিতে হয়। এদের গুণাগুণ বজায় থাকছে কিনা তা সময় সময় পরীক্ষা করে নিতে হয়, এর জৈব তথ্যগুলো নিয়ে তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তুলে তা গবেষকদের প্রয়োজনে তাদেরকে দেবার জন্য নেটওয়ার্কের ব্যবস্থা করে তুলতে হয়। উদ্ভিদ, শস্য ইত্যাদির সনাতন বৈচিত্রগুলোকে ধরে রাখার জন্য এ এক অতি আবশ্যকীয় ব্যবস্থা।

বীজ ব্যাংকে বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির বিভিন্ন জাতের বীজকে বিশেষ ব্যবস্থায় খুব নিম্ন উত্তাপে সংরক্ষিত করা হয়। অধিকাংশ বীজকে এভাবে বহু বছর সুপ্ত কিন্তু অঙ্কুরোদগমে সক্ষম হিসাবে রেখে দেয়া যায়। বিশেষ করে বিভিন্ন শস্যের ক্ষেত্রে ক্রমেই বহু বৈচিত্রের বদলে অর্থকরী ও উচ্চ ফলনশীল অল্প কিছু জাতকেই চাষ করার দিকে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এজন্য সনাতন বিচিত্র জাতগুলোর কৌলিক সম্পদকে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে ধরে রাখার জন্য বীজ ব্যাংক ছাড়া গত্যন্তর থাকছেনা। যেমন বাংলাদেশে অতীতের ও বর্তমানের বহু বিচিত্র জাতের ধানকে সংরক্ষণ করার জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্রের রয়েছে উন্নত বীজ ব্যাংক। এরকম আরো সমৃদ্ধ বীজ ব্যাংক রয়েছে আন্তর্জাতিক কেন্দ্রগুলোতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্ভিদের বীজকে শুকিয়ে তাদের আর্দ্রতা ৬% এর নীচে নামিয়ে এনে −১৮° সে. অথবা তার নীচের তাপমাত্রায় কামরার মত বড় ফ্রিজারের তাকে তাকে খামে খামে চিহ্নিত করে রাখা হয়। এভাবে বহু বছর ভাল থাকলেও বিভিন্ন বীজের এরকম সংরক্ষণ সক্ষমতার একটি সময়সীমা থাকে। সেটি চলে আসার আগেই বীজকে অঙ্কুরিত করে গাছ ফলিয়ে আবার বীজ সংগ্রহ করে তাকে

পরবর্তী দফায় আবার হিমায়িত করতে হয়। এভাবে চলতে পারে সীমাহীনভাবে। তবে কিছু কিছু উদ্ভিদের বীজের ধরন এমন যে তা সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুরিত হতে না পারলে মরে যায়– একে তাই ওভাবে হিমায়িত করে সংরক্ষণ সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে একে সব সময় চারিয়ে গাছ অবস্থাতেই সংরক্ষণ করতে হয়, প্রজন্মের পর প্রজন্ম যত্ন সহকারে।

পৃথিবীতে এখন মোট তেরশ'য়ের বেশি উল্লেখযোগ্য বীজ ব্যাংক রয়েছে। তাদের কিছু কিছু আন্তর্জাতিক উদ্যোগে ব্যাপক ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে। কোন কোনটিকে এত গুরুত্ব দেয়া হয় যে ভবিষ্যতে যে কোন দুর্যোগে তাকে সুরক্ষা দেবার পাকাপোক্ত ব্যবস্থাও করা হয়– কারণ এরা সারা বিশ্বের কোটি কোটি বছরে গড়ে উঠা অমূল্য কৌলিক সম্পদের নমুনা। একবার হারিয়ে গেলে আমরা তার কোন কোনটি চিরতরে হারিয়ে ফেলতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ নরওয়ের একটি দ্বীপ স্পীট্সবেরগেনে পর্বতের ভেতরে মানুষের তৈরি এক গভীর সুড়ঙ্গের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে স্ভালবার্ড আন্তর্জাতিক সীড ভল্ট। যে কোন ব্যাংকের সুরক্ষিত ভল্টের তুলনায় এটি অধিক সুরক্ষিত। এমনকি এর উপর দিয়ে যদি নিউক্লিয়ার যুদ্ধও হয়ে যায় তবুও এটি অক্ষত থাকবে। এ বীজ ব্যাংকের কৃত্রিম হিমায়ন কখনো নষ্ট হলেও এখানে চির বরফের পার্মাফ্রস্টের নীচে থাকাতে সব সময় এসব বীজ প্রয়োজনীয় নিম্ন তাপমাত্রায় থেকে যাবে।

ব্যক্তির কর্তব্য, বিশ্বের কর্তব্য

জীববৈচিত্রের ব্যবহার ব্যবস্থাপনা

জীববৈচিত্রকে রক্ষার উদ্যোগগুলোর মধ্যে দুটি প্রধান প্রকার আমরা দেখেছি– তাদের ইকোসিস্টেম রক্ষা, আর তাদের বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। তৃতীয় যে প্রকারের উদ্যোগগুলো নেয়া যায় সেগুলো কিন্তু আমাদের নিজেদেরকে সংযত করার ব্যাপার– আমরা কীভাবে জীববৈচিত্রকে ব্যবহার করবো সেটিকে একটি ব্যবস্থাপনার মধ্যে আনা। এই ব্যবস্থাপনা জীববৈচিত্রকে টেকসই রেখেই তাকে ব্যবহার করতে দেয়। যেমন বন ব্যবস্থাপনার বিষয়টি আমরা আগেই দেখেছি। নির্দিষ্ট বয়স হওয়ার পর প্রয়োজনীয় বৃক্ষ সীমিত সংখ্যায় কেটে ফেলে যে ফাঁক বনে সৃষ্টি হয়, সেখানে তার স্বাভাবিক পুনর্বাসন হতে পারে। সেই গাছ কাটার প্রক্রিয়া বাড়তি বনবিনষ্টির কারণ যেন না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হয়। তাই গাছ কাটার পদ্ধতি, তার পরিবহনের পদ্ধতি ইত্যাদিও গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে ভাবে বন উজাড় করে গাছ কেটে কাঠ আহরণ করছে এটি তার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রক্রিয়া। এই ব্যবস্থাপনা শুধু ইচ্ছার ব্যাপার নয়, এটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ব্যাপারও বটে। এরকম টেকসই ব্যবস্থাপনার উপর প্রচুর গবেষণা হয়েছে, এখনো তা হয়ে চলেছে।

বনের ক্ষেত্রে যা সত্য, জীববৈচিত্রের অন্য যে কোন আবাসের ক্ষেত্রেও তা সত্য। যেমন মাৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার কিছু কিছু প্রচেষ্টা অবশেষে বাধ্য হয়ে দেখা দিচ্ছে। প্রযুক্তিকে দক্ষ থেকে দক্ষতর করে ক্রমে বেশি বেশি মাছ সাগর ছেঁকে তোলা হচ্ছিল। বছরে মোট মাছ ধরা সাড়ে আট কোটি টনে পৌঁছার পর সেটি আর না বেড়ে একটু একটু বরং কমতেই শুরু করেছিল। স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে এত মাছ ধরাটি সমুদ্রের আর সইছেনা– এভাবে চল্‌লে শিগগির সেখানে বড় ধরনের একটি ধস নামবে। তাই আন্তর্জাতিক ভাবে নানা বিধিনিষেধ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছে সমুদ্রে মাছ ধরাকে সীমার মধ্যে রাখতে। নানা দেশের ভেতরে তার নিজস্ব নানা সীমাও টেনে দেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য একটিই– মাছের সাধারণ প্রজনন প্রক্রিয়া যেন ব্যাহত না হয়, এর মূল ষ্টকে যেন টান না পড়ে। এজন্য বাংলাদেশেও আমরা প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করি, ইলিশের জাটকা ধরার বিরুদ্ধে সারাদেশকে সচেতন করি। এখানেও আমরা ব্যবহার ব্যবস্থাপনাকে এমনভাবে দক্ষ করার চেষ্টা করছি যেন জীববৈচিত্র টেকসই

অবস্থায় থাকে। দেশে যেমন হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এ সব ব্যবস্থাপনার বিধি ঠিক ঠিক ভাবে সবাইকে মানানো কঠিন হয়। আন্তর্জাতিক চুক্তি হচ্ছে, কিন্তু সেই চুক্তির মধ্যে নানা ফাঁক ফোকর বের করে তার ব্যত্যয় ঘটানো হয়, টেকসই হওয়াটি অতিক্রম করেও চলে জীববৈচিত্রের ব্যবহার। তা ছাড়া গোপনে, বেআইনী ভাবেও এটি ঘটছে। এ সবের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক নজরদারিটাও খুব জরুরী।

অন্য নানা ক্ষেত্রেও নিয়মনীতি পাল্টাচ্ছে। আগের দিনের মত সখ করেই হোক, জীবিকা হিসাবেই হোক বন্য পশুপাখির শিকারকে সহজ ভাবে আর নেয়া হয়না। অনেক ক্ষেত্রেই আইন করেই তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেখানে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, বরং কোন প্রাণির সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজন রয়েছে সেখানেই শুধু কিছু শিকারের অনুমতি দেয়া হয়। আইনের বাইরে যা ঘটছে, অনেক ক্ষেত্রে রীতিমত সংঘবদ্ধ চক্রের হাতে ঘটছে, সেগুলো কঠোর ভাবে দমন করতে হবে।

ব্যক্তির জীবপ্রেমই ভিত্তি

সব কিছুর ভিত্তি কিন্তু সর্ব সাধারণের সচেতনতা এবং জীববৈচিত্রের প্রতি মমত্ববোধ। জীবতাত্ত্বিকভাবে আমাদের বেশির ভাগ প্রবণতা হলো এই মমত্বের দিকে। কিন্তু একে সচেতনতা দিয়ে, বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি দিয়ে সক্রিয় করে তুলতে হবে। জীববৈচিত্রের গুরুত্ব এবং কীভাবে এ বৈচিত্র বজায় থাকবে এ নিয়েও মোটামুটি ধারণা সবারই থাকা দরকার। সব রকমের জীববৈচিত্রের সঙ্গে সরাসরি পরিচিতি ও জ্ঞান যখন বাড়বে এর প্রতি আমাদের মমত্ববোধও তত বাড়বে। কীট পতঙ্গ থেকে শুরু করে সব প্রাণির সঙ্গে আমাদের জীব জগতের ঐক্যকে অনুভব করতে সক্ষম করবে। জীবের জন্য নানা প্রয়োজন, তার সুবিধা-অসুবিধা, তার পছন্দ-অপছন্দ আমরা অনুভব করতে পারবো, তেমনি তার সৌন্দর্যকেও উপভোগ করতে পারবো। এই মনোভাবের কারণে আমরা জীব জগত পর্যবেক্ষণ করতে, ইকোট্যুরিষ্ট হতে, চিড়িয়াখানায়, এক্যুরিয়ামে বা বোটানিক্যাল গার্ডেনে যেতে তাগিদ অনুভব করি। এই একই তাগিদে আমাদেরকে ব্যক্তিগত ভাবে জীববৈচিত্রকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হবার প্রেরণা যোগাবে। এজন্য জানার এবং সরাসরি পরিচিত হবার কোন বিকল্প নাই।

ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকেই সামাজিক আগ্রহের এবং জাতীয় আগ্রহের সৃষ্টি হয়। সকল পর্যায়ে এই আগ্রহ ও সক্রিয়তা বাড়বে, যদি জীববৈচিত্র নিয়ে সব উদ্বেগকে আমরা মানুষের কাছে স্পষ্ট করতে পারি। এ ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে তথ্য সংগ্রহ এবং সেই তথ্যকে সবার কাছে নিত্য পরিবেশন করাটি খুবই দরকার। এ শুধু

কোন প্রজাতি বিপন্ন হবার কাহিনী নয়, বরং বিপন্ন প্রাণিকে আবার বিকশিত করে তোলার প্রতিদিনকার চেষ্টা গুলোও পত্র পত্রিকা, টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে সবার কাছে জ্বাজ্জল্যমান করে তুলতে পারি। এই ব্যাপারে সব চেয়ে সহায়ক হচ্ছে ইন্টারনেট। উন্নত দেশগুলোতে প্রকৃতিপ্রেমিক নাগরিকদের অনেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিজেরাই জীববৈচিত্রের কাজগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছেন, গবেষণায় অংশও নিচ্ছেন। এভাবে ঘরে বসেই জীব বৈচিত্রের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত থাকা যায় যা আগে অকল্পনীয় ছিল। প্রায়শই টেলিমেট্রির মাধ্যমে পাওয়া তথ্যগুলো সরাসরি ইন্টারনেটে দিয়ে দেয়া হচ্ছে। এমনকি বাংলাদেশেও যখন সামুদ্রিক কাছিম 'উর্মি'কে টেলিমেট্রি যন্ত্র সহ সমুদ্রে ছেড়ে দেয়া হলো, পত্রিকায় ওয়েব সাইট দেখে অনেকেই দিনের পর দিন ইন্টারনেটে তার গতিবিধি অনুসরণ করেছে।

ব্যক্তিগত ভাবে জীববৈচিত্র সম্পর্কে উপলব্ধি করার ও উদ্যোগী হবার আর একটি সহায়ক বিষয় হলো এ সম্পর্কে ব্যক্তিগত স্মৃতি থেকে নিকট অতীতের হারিয়ে যাওয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে নূতন প্রজন্মকে জানানো। আমরা এক জীবনকালের মধ্যেই ছোটবেলায় যে পরিস্থিতি দেখছি অধিক বয়সে তা আর দেখছিনা। আগে যা ছিল তা যদি আমরা স্মরণ করি, যারা তা দেখেনি তাদের মধ্যে যদি সেদিনের কথা, সেদিনের ছবি সঞ্চারিত করতে পারি, তা হলে যা এখন হারিয়ে ফেলছি এ সম্পর্কে তাদের মধ্যে বেদনাবোধ ও প্রতিকারের আগ্রহ জন্মাতে পারে। এটিই সৃষ্টি করতে পারে জীববৈচিত্র সম্পর্কে একটি সামগ্রিক সামাজিক স্মৃতি, যা এই হারিয়ে ফেলাকে রুখতে সামাজিক ভাবে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে। আমাদের আশপাশের প্রাকৃতিক জীবপরিবেশ– বন, জংলা, জলা, খাল, বিল ইত্যাদির সুস্বাস্থ্য রক্ষা করা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে আমাদের জন্য জরুরী। এক সময় চিল ময়না, বকডাহুক, শেয়াল উদ আমাদের কাছাকাছি ছিল, আজ অনেক দূরে সরে গেছে, হয়তো কোন কোনটি একেবারেই থাকছেনা। ঐ সামগ্রিক সামাজিক স্মৃতিই আমাদেরকে এরকম হারিয়ে যাওয়া ঠেকাতে উদ্বুদ্ধ করবে।

জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করতে হবে

জীববৈচিত্র সম্পর্কে আমরা সব কিছু জানিনা, জানার বাকি রয়ে গেছে আরো অনেক। যত প্রজাতি রয়েছে সেগুলোর একটি অংশকে শুধু আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি, নাম দিতে পেরেছি। তার মধ্যেও সবাইকে সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা নিরিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। বাকিদের সম্পর্কে যেটুকু জানছি, যেটুকু

আন্দাজ করতে পারছি তা প্রধানত গাণিতিক মডেলিং এর মাধ্যমে। এগুলোকে ক্রমে আরো বেশি বেশি করে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে আনতে হবে। জ্ঞানের এই একটি এলাকা যেটি সারা পৃথিবীময় অনুসন্ধান ও কাজের উপর নির্ভর করছে। শুধু বড় বড় কতগুলো গবেষণাগার থেকে এটি সম্ভব নয়। এমনকি শুধু পেশাদার বিজ্ঞানীদের উপর নির্ভর করেও সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে পৃথিবীর সর্বত্র স্থানীয়ভাবে অসংখ্য প্রকৃতি প্রেমিক মানুষের আগ্রহের উপরও এটি অনেক খানি নির্ভর করবে। এই প্রকৃতি প্রেমিকদের যত বেশি সংখ্যায় সর্বত্র গড়ে তোলা যাবে ততই কাজটি দ্রুততর হবে। ইন্টারনেটে নানা নেটওয়ার্কে পরস্পরের সঙ্গে নিত্য যুক্ত থাকতে পারার কারণে প্রকৃতি প্রেমিকদের কাজ অনেক দক্ষতর হচ্ছে।

বর্তমানে বিশ্বের জীববৈচিত্র নিয়ে একটি ম্যাপিং, একটি তথ্য ভাণ্ডার (ডাটাবেস) গড়ে উঠেছে। ক্রমেই এটি নূতন নূতন তথ্যে সমৃদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যেও থেকে যাচ্ছে অনেক অজানার এলাকা। সেগুলোকে ক্রমে সম্পূর্ণ করতে হবে। কারণ সম্পূর্ণ জ্ঞান ছাড়া প্রতিকারের পুরো কর্মকৌশলটি রচনা করা যায়না।

স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের নজর কাড়বে জীববৈচিত্র নিয়ে বড় যুদ্ধগুলো যেখানে চলছে সে সব জায়গা। বাদল বন, খাড়ি, প্রবাল প্রাচীর ইত্যাদি সম্পর্কে খুঁটিনাটি না জানলে, সেগুলো রক্ষা করতে না পারলে সেই বড় যুদ্ধেই আমরা হেরে যাব। কাজেই এদের নিয়ে নজরদারি ও গবেষণা যেমন বেশি হবে, তেমনি তাদের সংরক্ষণে বিশ্বজোড়া আন্দোলন জোরদার হওয়াটিও স্বাভাবিক। কিন্তু ছোট যুদ্ধগুলোকেও অবহেলা করার মত নয়। তৃণভূমিতে, মরুতে, পাহাড়ে, হ্রদের বা সমুদ্রের মাঝে, জলাতে, এরকম অনেক ছোট ছোট যুদ্ধও গবেষণা ও সচেতনতার ভিত্তিতে চালাতে হবে। বাংলাদেশের মত জনবহুল অর্থনৈতিক সংগ্রামে রত দেশেও ঝোপঝাড়, বন, জলা, খাল, বিল, হাওড় বাওড়ের জীববৈচিত্রকে সস্নেহে রক্ষা করতে হবে। সে জন্য এগুলো সম্পর্কে প্রচুর জানতে হবে, এদেরকে ভালবাসতে হবে। আমাদের নিজেদের উন্নয়নের সংগ্রামেও এখানকার জীববৈচিত্র সহায়ক হবে, যদি আমরা দীর্ঘমেয়াদে সেটি চিন্তা করি, আমাদের আগামী প্রজন্মগুলোকেও হিসাবের মধ্যে নিয়ে।

বিশ্ব উদ্যোগ

জীব বৈচিত্র রক্ষার অনেকগুলো আইন ও উদ্যোগ বিশ্বের নানা দেশের সমঝোতার ভিত্তিতে নিতে হয়। একটি বিপন্ন প্রজাতির জন্য প্রজনন কর্মসূচি নিতে গেলেও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দরকার হয়। যেসব দেশে অবশিষ্ট কয়েকটি সদস্য রয়েছে, যেসব দেশে এরকম কর্মসূচির উন্নত সুযোগ রয়েছে,

তাদের সমঝোতার মাধ্যমেই প্রজাতিটিকে বাঁচাবার উদ্যোগ নেয়া যায়। অন্য দিকে মাৎস্য সম্পদ রক্ষা বা বন সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে আরো ব্যাপক আন্তর্জাতিক সমঝোতা ও চুক্তির দরকার হয়। পৃথিবীর অবশিষ্ট জীববৈচিত্রের আকরগুলো এখন বিশ্ব সম্পদ হিসাবে পরিগণিত, তাদের রক্ষার দায়িত্ব তাই পুরো বিশ্ববাসীর। চুক্তিগুলো সব সময় যে শুধু বিধি নিষেধ আরোপের জন্য তা নয়। অনেক বড় বড় জাতীয় ও আন্ত-র্জাতিক উদ্যোগ– সংরক্ষণ কর্মসূচি, অভয়ারণ্য, আন্তর্জাতিক বীজ-ব্যাংক ইত্যাদিও গড়ে উঠেছে এমনি সব সমঝোতার মাধ্যমে। এরকম স্থাপনাগুলোর মধ্যে খুব ব্যাপক চমকপ্রদ উদাহরণ হলো সাম্প্রতিককালে সম্পন্ন ও পরিকল্পিত মেগাকরিডরগুলো। জীববৈচিত্রের বসতগুলোর মধ্যে সংযোগকারী করিডর দিয়ে অনেক প্রাণির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আনাগোনার বড় গণ্ডি দেওয়া সম্ভব হয়। নগরায়ন, বড় সড়ক, রেলপথ ইত্যাদির কারণে যখন এরকম করিডর বাধাগ্রস্থ হয় তখন বিশেষ ব্যবস্থায়– প্রয়োজনে ওসবকে এড়িয়ে এমন কি ওসবের উপর দিয়ে সরু বনের ওভারপাস তৈরি করে দিয়ে, বন্য প্রাণির যাতায়াতের করিডর নিরবিচ্ছিন্ন রাখা হয়। দেশের মধ্যে তো বটেই, এখন অনেক ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে, আন্তর্জাতিক, এমনকি মহাদেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত জীববৈচিত্রের জন্য করিডর করে দেয়া হচ্ছে। সঙ্গত কারণেই এদের বলা হয় মেগাকরিডর। বিচিত্র প্রাণিকে অবাধ যাতায়াতের সুযোগ দেবার জন্য এর চেয়ে সুন্দর ব্যবস্থা আর কী হতে পারে?

মেগাকরিডর সাধারণত দূর-পাল্লার করিডর– বনাঞ্চল সৃষ্টি করে দিয়ে বর্তমান সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলোকে সংযুক্ত করে দেয়। এর ফলে প্রাণিদের দেশ থেকে দেশান্তরে চলে যেতে কোন বাধা থাকেনা। তাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রজনন সম্ভব হওয়াতে তাদের জেনেটিক সমৃদ্ধি ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ স্পেনের পুরো উত্তরাঞ্চল জুড়ে পশ্চিমে ক্যান্টাব্রিয়ান পর্বত থেকে পূর্বে ফ্রান্সের সঙ্গে পীরানিজ পর্বত পর্যন্ত অনেকগুলো সংরক্ষিত এলাকাকে যুক্ত করে একটি মেগাকরিডর পরিকল্পিত হয়েছে যা ফ্রান্সের ভেতর দিয়ে ইটালী ও সুইজারল্যাণ্ড সীমান্তে পশ্চিম আল্পস পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এটিই হয়তো পরে আন্ত-ইউরোপীয় মেগাকরিডরে পরিণত হবে। আফ্রিকার বড় বড় তৃণভোজী জেব্রা, ওয়াইল্ডিবীষ্ট প্রতি বছর মহাযাত্রা করে পাড়ি দেয় বহু শত কিলোমিটার। নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত এরা কাটায় দক্ষিণ টানজানিয়ার গোরোঙ্গোরো সংরক্ষিত এলাকায়। তারপর চলে উত্তর অভিমুখে মহাযাত্রায়– মে-জুনে পৌঁছে উত্তর টানজানিয়ার সেরেঙ্গেতি ন্যাশনাল পার্কে। তারপর আরো উত্তরে কেনিয়াতে গিয়ে পৌঁছে জুলাই মাসে, মাসাইমারা ন্যাশনাল পার্কে। এরপর অক্টোবরের দিকে আবার ফিরে আসে দক্ষিণে। চিরকাল এই মহাযাত্রার উপরেই এসব প্রাণির সংখ্যা-সমৃদ্ধি নির্ভর

করেছে। উন্নয়ন কর্ম, নগরায়ন ইত্যাদির ফলে যাত্রাপথে যেন কোন বিঘ্ন না ঘটে সে জন্য এখানেও পরিকল্পিত হয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন মেগাকরিডর।

চুক্তি ও সমঝোতা শুধু দেশে দেশে নয় বহু দেশের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন পক্ষের মধ্যেও জীববৈচিত্র রক্ষাকারী চুক্তি অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারে। বিশাল দেশ কানাডার পূর্বে আটলান্টিক তীর থেকে পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর পর্যন্ত বনভূমিকে সংরক্ষিত রেখে টেকসই পর্যায়ে কাঠ আহরণের চুক্তি করেছে সকল ব্যবসায়ী ও পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো। এ চুক্তি অনুযায়ী সাত কোটি ২০ লাখ হেক্টর বনাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় অনেকগুলো এলাকায় গাছ কাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। উত্তম টেকসই বন ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে এটি একটি চমৎকার ব্যবস্থা। ঠিক এরকম আর একটি চুক্তি আগে থেকেই রয়েছে ব্রাজিলে আমাজন রক্ষার জন্য। এসব চুক্তির বাস্তবায়ন সাফল্যের উপর নির্ভর করছে অনেক জীববৈচিত্রের ভবিষ্যৎ।

লক্ষ্যমাত্রা কী রকমের

১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডে জেনেরিওতে ধরিত্রী সম্মেলনে টেকসই উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যে ক'টি রূপরেখা তৈরি করা হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল জীববৈচিত্র নিয়ে। জীববৈচিত্র কনভনেশন (সি বি ডি) নামে পরিচিত এই রূপরেখার তিনটি উদ্দেশ্য ছিলঃ জীববৈচিত্রের সংরক্ষণ, এর নানা উপাদানের টেকসই ব্যবহার, এবং বিশ্ব জেনেটিক সম্পদের উপকারগুলোর সমবন্টন। পরে কয়েক দফায় এর উপর কিছু বাস্তব সমঝোতায় পৌঁছেছে বিশ্বের অনেক দেশ। কিন্তু ২০১০ এর জানুয়ারিতে যখন এ নিয়ে ইতোমধ্যে হওয়া অগ্রগতির খতিয়ান নেয়া হলো দেখা গেছে ২০০২ এর জীববৈচিত্র শীর্ষ সম্মেলনে জীববৈচিত্র অবক্ষয় ঠেকাবার জন্য যে সব লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছিল কোন দেশই তা পূরণ করতে পারেনি। জীব বিলুপ্তির গতিতে যথেষ্ট রাশ টানা সম্ভব হয়নি। দুনিয়ায় জীববৈচিত্রের জন্য মোট সংরক্ষিত এলাকা এ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে স্থল ভাগের ১২% এবং জলভাগের মাত্র ১% এ। লক্ষ্যমাত্রা ছিল উভয়ক্ষেত্রে একে ১৫% এ নিয়ে যাওয়া। ২০১০ সালের অক্টোবরে জাপানের নাগোয়া শহরে ১২দিন ব্যাপী জীববৈচিত্র বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৯৩টি দেশ ২০২০ এর জন্য লক্ষ্য মাত্রা নূতন করে নির্ধারণ করেছে। এজন্য ১৭% স্থল ভাগ আর ১০% সমুদ্র এলাকা জীববৈচিত্রের জন্য সংরক্ষিত করার লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে। পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো অবশ্য এর চেয়ে বেশি প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করে। বন ও প্রবাল প্রাচীর রক্ষা এবং মাৎস্য সম্পদ রক্ষা এ সম্মেলনে

বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এগুলো বাস্তবায়নের জন্য ২০ দফা একটি কৌশলপত্রও প্রণয়ন করা হয়েছে। এসবের বাস্তবায়নে প্রত্যেক দেশ তার নিজস্ব দায়িত্ব ও নিজস্ব লক্ষ্যমাত্রার প্রতি আরো অনেক মনোযোগী হতে হবে।

২০১০ এর জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য মোট অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন ছিল তাতে ঘাটতি দেখা দিয়েছে বিভিন্ন হিসাবে বছরে ১০ বিলিয়ন ডলার থেকে ৫০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত। এ ধরনের বাড়তি অর্থের যোগান আসা প্রয়োজন। ফসলের ও গাছের বিশেষ বিশেষ জাতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় অনেক ভাল গুণ সম্পন্ন জাতের কৌলিক সম্পদ হারিয়ে যাবার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাকে ঠেকাতে ব্যবহারকারী পর্যায়ে সেগুলোকে আকর্ষণীয়ও জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রেও লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। টেকসই আহরণ ব্যবস্থাপনার তদারকি জোরদার করার পরিকল্পনা রয়েছে– যা বাস্তবায়নেও বিভিন্ন দেশের আগ্রহ ও অর্থায়ন প্রয়োজন রয়েছে। জীববৈচিত্রের কৌলিক সম্পদ ও তার জ্ঞানের উপর একচেটিয়া দখল যেন শক্তিশালীদের হাতে চলে না যায় সে জন্য প্যাটেন্ট, রয়্যালটি, মেধা-স্বত্ত-অধিকার ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে যাদের থেকে ঐ জীববৈচিত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে তাদের অধিকারটিকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখার নিয়ম চালু হচ্ছে। এর ফলে হয়তো ভবিষ্যতে সি বি ডি'র তৃতীয় উদ্দেশ্য অর্থাৎ কৌলিক সম্পদের সুবিধাকে সম-বন্টনের একটি সুরাহা হবে। এজন্য আশা করা হচ্ছে যে ভবিষ্যতে জীববৈচিত্র ও তার জেনেটিক গঠন সম্পর্কিত জ্ঞানে সব দেশের সব মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রযুক্তি হস্তান্তর সুগম হবে।

অর্থনীতির সঙ্গে এক করে বিবেচনা

জীববৈচিত্রের অবক্ষয়ের পথে বড় কারণ হিসেবে যেটি বার বার উঠে আসে তা হলো মানুষের অর্থনৈতিক লোভ এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজন। তাই বেপরোয়া গাছ কাটা, মাছ ধরা, শিল্প, কৃষি, পশুচারণ, পরিবহন, নগরায়ন এসব কর্মকাণ্ডেরই বলি হচ্ছে যাবতীয় জীববৈচিত্র। এই যে জীববৈচিত্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক কাজের বৈপরীত্য, এটি না গুচাতে পারলে অবক্ষয়ের এই বড় পথটি থেকেই যাবে। আজকাল তাই উভয়টিকে পরস্পরের সহযোগী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। যেমন ইকোট্যুরিজমের কথাই ধরা যাক– অনেক দেশের জন্য এটি অন্যতম লাভজনক আর্থিক কাজ হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। জীববৈচিত্রের সংরক্ষিত এলাকাগুলোকে উন্নত করে এবং তার বহির্বেষ্টনীতে পর্যটকদের আকৃষ্ট করে স্থানীয় মানুষের বহু কর্মসংস্থান হচ্ছে। ২০১০ সালের হিসাবে দুনিয়াতে মোট ১

লক্ষ ১০ হাজার সংরক্ষিত এলাকার উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করছে মোট প্রায় ১১০ কোটি মানুষ।

শুধু তাই কেন – নানা জীবের বসতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে আরো নানা আর্থিক কর্মকাণ্ড চালানো যেতে পারে। এভাবে সংরক্ষিত জীববৈচিত্রপূর্ণ পরিবেশের সঙ্গে একীভূত ভাবেও সম্ভব কৃষি, পশুচারণ, লাভজনক বাগান, ভেষজ গাছপালার বিস্তার– এমনি আরো অনেক কিছু। শুধু দেখতে হবে এ কাজগুলোর ফলে জীববৈচিত্রের কোন ক্ষতি ঘটছে কিনা। যেখানে জীববৈচিত্র নিজে অজৈব ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, আমরা অর্থনৈতিক দায়িত্বটিও সেই জীববৈচিত্রের হাতে দিয়ে উভয় কুল রক্ষা করতে পারে। ক্ষতিকর রাসায়নিক সার বা কীটনাশকের বদলে আমরা যখন জীব-নির্ভর সার বা একীভূত বালাই নাশক প্রক্রিয়া ব্যবহার করি তখন এই কাজটিই করে থাকি। জীববৈচিত্র রক্ষা করতে হবে তার সঙ্গে মানুষের জীবনকে সুসমঞ্জসভাবে যোগ করে, মানুষকে বাদ দিয়ে নয়। এজন্য সংরক্ষিত এলাকা যখন গড়ে তোলা হয় তখন তাকে কেন্দ্র করে ভ্রমণ, শিক্ষা, পরিমিত সম্পদ আহরণ, বিনোদন ইত্যাদি নানা বিষয়ের সমন্বয় করার চেষ্টা করা উচিত মানুষের জীবন-জীবিকায় অবদান রেখে। সব চেয়ে বড় কথা হলো আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় জীববৈচিত্রের অবদানগুলোকে যথাসম্ভব হিসাবের মধ্যে আনতে হবে। যেখানে সম্ভব আমাদের প্রয়োজনীয় সেবাগুলো যদি আমরা কৃত্রিম অজৈব ব্যবস্থা থেকে না নিয়ে জীববৈচিত্রের গড়া প্রাকৃতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিতে পারি সেটি আমাদের বেছে নেয়া উচিত। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য আমরা পানি বিশোধন কেন্দ্র স্থাপন করে ক্লোরিন ইত্যাদির মাধ্যমে সেই পানি পেতে পারি। এ জন্য পানির উৎসকে দূষণ মুক্ত করার কোন তাগিদও হয়তো আমাদের থাকবেনা। কিন্তু তা না করে আমরা দূষণমুক্ত বনভূমি, শৈবাল ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পানির উৎসকে আসতে দিয়ে মোটামুটি বিশুদ্ধ পানিই পেতে পারি– যা পরে ন্যূনতম হস্তক্ষেপেই নিরাপদ হবে। জলাশয় সংস্কার, বর্জ্য নিষ্কাশন ইত্যাদি আরো নানা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা জীববৈচিত্রকে অগ্রাধিকার দিতে পারি। আমরা যদি জীবনযাত্রার পথগুলো পাড়ি দিতে জীববৈচিত্রকে সাথী করি তা হলে তা যে শুধু পরিবেশবান্ধব হবে তা নয়, সেটি অর্থনৈতিক দিক থেকেও বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কেউ কেউ মনে করেন যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দারিদ্র দূরীকরণ করতে গিয়ে জীববৈচিত্র রক্ষার দিকে নজর দেয়া সম্ভব নয়। তাঁদের কথা হলো মানুষ বাঁচাবো না অন্য জীব বাঁচাবো– দুটি এক সঙ্গে করার সম্পদ কোথায়? কিন্তু কোষ্টারিকার মত বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশের উদাহরণ থেকে প্রমাণ হয়েছে যে জীববৈচিত্র

রক্ষার পদক্ষেপগুলো দারিদ্র দূরীকরণেরও পদক্ষেপ হতে পারে। এই দুইয়ের মধ্যে দ্বন্ধ থাকার কোন প্রয়োজন নাই। বরং দেশের জৈব সম্পদকে রক্ষা করেই টেকসই দারিদ্র দূরীকরণ পদক্ষেপগুলো নেয়া যায়।

সব মানুষের জীবনভঙ্গিটি গুরুত্বপূর্ণ

শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার সব মানুষের জীবনভঙ্গিটির উপরেই নির্ভর করবে জীববৈচিত্রের এবং যেই সুবাদে আমাদের ভবিষ্যৎ। এই ক্ষেত্রে জীববৈচিত্রের উপর আমাদের আরো একটি আচরণের পরোক্ষ প্রভাবটি স্মরণ করতে হবে। সেটি হলো গ্রীন হাউস গ্যাস উদ্গীরণের মাধ্যমে বিশ্ব-জলবায়ু পরিবর্তন। এই প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠের গড় উষ্ণতা আরো বাড়লে আমরা যে রকম বিপন্ন হবো তেমনি ব্যাপক ভাবে জীববৈচিত্রও বিপন্ন হবে। সামনের দিনগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন কতটা ভয়াবহ হবে তাও নির্ভর করছে আমাদের জীবনভঙ্গির উপর। আমরা কি ফসিল জ্বালানি নির্ভর, অধিক বর্জ্যসৃষ্টি-নির্ভর, ক্রমাগত অধিক ভোগের জীবনভঙ্গির দিকে যাব, না নবায়নযোগ্য শক্তি ও বস্তু রিসাইক্লিং উপর নির্ভর করে পরিমিত ভোগের টেকসই জীবনভঙ্গির দিকে যাব, তার উপরে অনেকটা নির্ভর করবে আমাদের ভবিষ্যৎ, পুরো জীবজগতের ভবিষ্যত।

একই কথা জীববৈচিত্রের প্রতি আমাদের মনোভঙ্গির সম্পর্কেও খাটে। আমরা যদি একে উপভোগ করি, এর পরিবেশে বসবাস করে আনন্দ পাই, জীবপ্রেমকে আমাদের মৌলিক আবেগের অংশ করে নিই, তা হলে আমাদের সৃষ্ট জীব-বিলুপ্তির যে ধারা চলছে তাকে রুখতে আমরা হয়তো সমর্থ হবো। সেই সঙ্গে নিজেদের ভবিষ্যতকেও শঙ্কামুক্ত করতে পারবো।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। জীববৈচিত্র হারাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের লোকায়ত সংস্কৃতি ও জ্ঞানকেও কি হারিয়ে ফেলছিনা?

উত্তর: অবশ্যই। আমাদের সনাতন লোকায়ত সংস্কৃতির অনেকখানিই জীববৈচিত্রকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। যেমন বিভিন্ন ঘাস-পাতা গুল্ম ইত্যাদির কথাই ধরা যাক। একসময় সাধারণ মানুষও জানতো এগুলো কোনটির কী ভেষজ গুণ রয়েছে, দৈনন্দিন সেগুলো ব্যবহারও করতো। অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিচিত্র উদ্ভিদ ও প্রাণিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এক এক সমাজের এক এক সমৃদ্ধ লোকায়ত রীতি নীতি ও জ্ঞানসম্পদ। এগুলো বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই সাংস্কৃতিক ধারাও বিলুপ্ত হচ্ছে বৈকি। আমাদের জীবপ্রেমের অংশ হিসাবেই এমন লোকায়ত সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পেরেছিল। এই দিকটি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠিদের কৃষ্টিবৈচিত্রের ক্ষেত্রে। সেজন্য দেখা যায় জীববৈচিত্র যেখানে বেশি সেই অঞ্চলগুলোতেই এরকম অধিক সমৃদ্ধ কৃষ্টিবৈচিত্র রয়েছে। এই দুইয়ের ভাগ্য একসূত্রে গাঁথা।

প্রশ্ন ২। আমাদের জানার বাইরে যে সব প্রজাতিগুলো রয়েছে সেগুলো মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানের মাধ্যমে ক্রমাগত আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং জানা তালিকাটি বড় হচ্ছে। এর মধ্যে অনুসন্ধানে পাওয়ার আগেই গাণিতিক মডেলিং এর মাধ্যমে প্রজাতির প্রকৃত সংখ্যা আন্দাজ করছি কী ভাবে?

উত্তর: এটিই গাণিতিক মডেলিং এর বিশেষ ক্ষমতা– জানা তথ্য থেকে অজানা তথ্য উদ্ঘাটন। এটি সম্ভব হয় পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে জীববৈচিত্রের সম্পর্কের গাণিতিক সম্পর্কগুলোর ভিত্তিতে। মডেলিংএর জন্য এই গাণিতিক সম্পর্কগুলো আগে আবিষ্কার করতে হয়– অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। তারপর জানা উপাত্তগুলো থেকে অজানা পরিস্থিতি, সংখ্যা ইত্যাদি বের করা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন ৩। আজকাল প্রাচীন মৃতদেহ, হাড় ইত্যাদি থেকে ডিএনএ নেয়া সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে ব্যাকটেরিয়া পর্যায়ে হলেও একটি জীবের সম্পূর্ণ জেনোম আরেকটির জেনোম দিয়ে প্রতিস্থাপিত করাও সম্ভব হয়েছে। বিলুপ্ত প্রাণির

ডিএনএ তার সদৃশ জীবিত প্রজাতির গর্ভের ভ্রূণের জেনোমে প্রতিস্থাপিত করে প্রজাতিটিকে কি আবার ফেরৎ আনা যায়?

উত্তর: কিছুদিন আগে পর্যন্ত এরকম চিন্তা নেহাতই বিজ্ঞানের কল্পকাহিনী ছিল– যেমন জুরাসিক পার্ক উপন্যাসটিতে ডাইনোসরদেরকে এই পদ্ধতিতে ফিরিয়ে আনার ঘটনাটি। এখন কিন্তু তা রীতিমত বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়– সম্ভাবনার একেবারে বাইরে নয়। অষ্ট্রেলিয়ায় সম্প্রতি বিলুপ্ত টাসমেনিয়ান টাইগারকে ফিরিয়ে আনার জন্য সত্যি সত্যি এরকম চেষ্টা হয়েছে– ফলাফল না এলেও। এখনো সংরক্ষিত মৃতদেহ থেকে ভাল ডিএনএ পাওয়া যায় এমন বিলুপ্ত প্রাণিগুলোর ক্ষেত্রে এর কিছু সম্ভাবনা রয়েছে বৈকি। বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ মনে করেন ভবিষ্যতে অন্তত কোন কোন প্রজাতির ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। বরফ শীতল পার্মাফ্রস্টের মধ্যে পাওয়া প্রায় অবিকৃত মৃতদেহ যথেষ্ট পাওয়া গেছে এমন বিলুপ্ত প্রাণি পশমী গণ্ডারের ক্ষেত্রে তাঁরা আশাবাদী। কারণ এর খুব নিকট ধরনের প্রাণি জীবিত রয়েছে যাদেরকে জিন প্রতিস্থাপিত ভ্রূণের জন্য বিকল্প মা হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। অন্যান্য বিজ্ঞানীরা অবশ্য এ ব্যাপারে মোটেই আশাবাদী নন্– তাঁরা বিলুপ্তি ঠেকাবার এই পদ্ধতিকে অর্থ ও সময়ের অপব্যয় মনে করেন।

প্রশ্ন ৪। কোন কোন বিশেষ প্রাণিকে রক্ষার জন্য অভয়ারণ্যগুলোও কি এক রকম কৃত্রিমও ব্যবস্থা নয়? জীব সমাজের যে সামগ্রিক পরিবেশ তার অভাবে সেখানে ভারসাম্য কী ভাবে রক্ষিত হয়?

উত্তর: সব অভয়ারণ্যেই চেষ্টা করা হয় যেন একটি সার্বিক জীব পরিবেশ সেখানে থাকে। তাই সংরক্ষণ করার বিশেষ প্রাণিগুলো ছাড়াও তাতে স্বাভাবিক জীব সমাজের অন্যান্য প্রজাতিরাও যথাসম্ভব থাকে। যতখানি সম্ভব প্রাকৃতিক পরিবেশে ঐ প্রাণিদেরকে রাখাই অভয়ারণ্যের উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ৫। জীববৈচিত্র নিয়ে যারা আলোচনা করছেন তাঁদের অধিকাংশই শহরের শিক্ষিত পরিবেশবাদী মানুষ। জীববৈচিত্রের মধ্যে যাঁরা বাস করছেন সেই গ্রাম ও বনাঞ্চলের মানুষের কাছে এর বার্তাটি না পৌঁছলে জীববৈচিত্র রক্ষার আসল কাজটি হবে কীভাবে?

উত্তর: এটি খুবই সত্য কথা। জীববৈচিত্রের কাছাকাছি থাকা পল্লী অঞ্চলের মানুষ চোখের সামনে প্রজাতিগুলো হারিয়ে যাওয়াটি লক্ষ্য করছেন, কিন্তু এর তাৎপর্য নিয়ে হয়তো তেমন ভাবছেননা। এদিক থেকে তাঁদেরকে জীববৈচিত্র রক্ষার

আন্দোলনে সক্রিয় করাটি খুব প্রয়োজন। টেলিভিশনের মত শক্তিশালী গণমাধ্যম এতে খুব সহায়ক হতে পারে।

প্রশ্ন ৬। এক সময় শালবন, সিলেট বা চট্টগ্রামের বনেও বাঘ জাতীয় প্রাণি ছিল। দেশের নানা অঞ্চল থেকে মেছো বাঘ, বাঘডাঁশ ইত্যাদি প্রাণি লোপ পেয়েছে। এর প্রত্যক্ষ ফল কি আমরা এখন অনুভব করছি?

উত্তর: এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেই বুঝা যায়। এক একটি প্রজাতির স্থানীয় বিলুপ্তিই স্থানীয় জীবসমাজের উপর প্রভাব রাখছে– অন্যদের বিলুপ্তির পথ করে দিচ্ছে। এর উপর যদি গবেষণা করা হতো তা হলে আমাদের দেশের জীব পরিবেশের পরিস্থিতিগুলো আরো স্পষ্ট ধরা পড়তো।

প্রশ্ন ৭। আমাদের দেশেই দেখতে পাচ্ছি ঘন ঘন উচ্চ মাত্রার ঘূর্ণিঝড়ে, সমুদ্রপৃষ্ঠ উচ্চ হওয়াতে নোনা ঢুকে এবং বন্যায় অনেক জীববৈচিত্র নষ্ট হচ্ছে, হুমকিতে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনই কি জীববৈচিত্র নষ্টের বড় কারণ নয়?

উত্তর: পৃথিবীর ইতিহাসে জীববৈচিত্রের উপর জলবায়ু পরিবর্তন সব সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অতীতে বড় বড় বেশ কিছু গণ-বিলুপ্তি বড় ধরনের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেই ঘটেছিল। এখন গ্রীন হাউস গ্যাস উদ্গীরণের ফলে যে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে জীববৈচিত্রের উপর তার বিরূপ প্রভাব ইতোমধ্যেই যথেষ্ট স্পষ্ট। এখনকার এই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আমরাই দায়ী। তাই এরও সমাধান আমাদের নিজেদের আচরণের সংশোধনের মধ্যেই রয়েছে।

প্রশ্ন ৮। আমরা দেখছি যে উদ্ভিদের প্রাথমিক উৎপাদন জীববৈচিত্রের ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করছে। বাদল বনের মত কোন কোন অঞ্চলে এই উৎপাদন অনেক বেশি, আবার মরু অঞ্চলের মত অন্যত্র খুব কম। আমরা কি বৈজ্ঞানিক ভাবে চেষ্টা করে এই প্রাথমিক উৎপাদন বাড়াতে পারিনা?

উত্তর: সীমিত আকারে পারি। যেমন কোন কোন মরু অঞ্চলকে সবুজ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ধনী কিছু আরব দেশের পক্ষে এটি যতখানি সম্ভব অন্যত্র তা নয়, কারণ এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল হতে পারে। তা ছাড়া আমরা পৃথিবীর বিশাল বিশাল অঞ্চলের কথা বলছি। তার চেয়ে অনেক সহজ কাজ উচ্চ প্রাথমিক উৎপাদনের অঞ্চলগুলোতে প্রাকৃতিক ভাবে জীববৈচিত্র রক্ষার চেষ্টা করা।

প্রশ্ন ৯। আমাদের জীববৈচিত্র রক্ষার দুটি উপায়– একটি জীববৈচিত্রকে তার মতো করে নিজস্ব পরিবেশে থাকতে দেয়া এবং অন্যটি সমস্যা যেখানে সৃষ্টি হচ্ছে তার প্রতিকার করে জীববৈচিত্রকে লালনের ব্যবস্থা করা। প্রথমটিই কি উত্তম পদ্ধতি নয়?

উত্তর: হ্যাঁ ঠিক তাই। তাদের নিজস্ব পরিবেশ যদি রক্ষা করা যেত তা হলে অন্য কিছু প্রয়োজন হতোনা। কিন্তু তা বাস্তবে পুরাপুরি আর সম্ভব নয় বলে এই দুটি উপায়ের উভয়কেই কাজে লাগাতে হবে। পৃথিবীতে মানুষের জনসংখ্যা যা দাঁড়িয়েছে এবং তাদের জীবন মান উন্নয়নের যে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে তাতে প্রাকৃতিক পরিবেশ সবক্ষেত্রে অক্ষত রাখা দুঃসাধ্য। ক্রমবর্দ্ধমান কৃষির জন্য ও উন্নয়নের জন্য কিছু গাছ, কিছু বনাঞ্চল, কিছু জলাশয় নষ্ট যে হবে তা অবধারিত। তাই ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থাগুলোও সঙ্গে সঙ্গে নিতে হবে– যেমন জীববৈচিত্রের জন্য সংরক্ষিত অঞ্চল সৃষ্টি করে। সমস্যা হচ্ছে আমরা নিজের প্রকৃত প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে জীববৈচিত্রের প্রয়োজনটি মনে রাখছিনা। এটিই বর্তমান সংকটের বড় কারণ।

প্রশ্ন ১০। আমরা যদি বন ধ্বংসের প্রতিকারে নূতন বনায়ন করি সেখানে দ্রুত বর্দ্ধনশীল নূতন বিজাতীয় গাছ লাগাবার প্রবণতাই দেখি। এর দ্বারা ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ কি হয়?

উত্তর: আমাদের দিক থেকে কোন কোন ক্ষতি হয়তো পূরণ হয়, কিন্তু জীববৈচিত্রের দিক থেকে হয়না। যে আদি বন আমরা নষ্ট করেছি সেটি গড়ে উঠেছিল জীববৈচিত্রের শত ভূবনের একটি আকর হিসাবে। এর ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ করতে হলে আমাদেরকে হুবহু সে রকম বনই সৃষ্টি করতে হবে– তাতে যত বছরই লাগুক না কেন। একই রকম প্রজাতির দ্রুত বর্দ্ধনশীল বৃক্ষের বা অর্থনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষের বাগান করে জীববৈচিত্র পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ১১। বাংলাদেশের মত ঘনবসতির দেশে অর্থনৈতিক উন্নতি করতে হলে জীববৈচিত্রের উপর আঘাত আসা খুবই স্বাভাবিক। উন্নয়নের কাজ বজায় রেখে আমরা এটি কী ভাবে করতে পারি?

উত্তর: এই কৌশলগুলো বেছে নেয়াই আজ আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। জীববৈচিত্র ধ্বংসের বিনিময়ে উন্নয়ন করতে চাইলে সেটি টেকসই উন্নয়ন হবেনা। আপাতদৃষ্টিতে স্বল্প মেয়াদে মনে হবে যে আমরা লাভবান হচ্ছি, কিন্তু

দীর্ঘমেয়াদে আমরা বরং বড় সংকট ডেকে আনবো– যেটি পারিবেশিক ও অর্থনৈতিক উভয় ভাবে আমাদেরকে বিপর্যস্ত করবে। তাই এখন থেকেই সুপরিকল্পিত ভাবে উন্নয়নের জীববৈচিত্র-বান্ধব পথকে বেছে নিতে হবে। এটি কঠিন হতে পারে, কিন্তু এটি সম্ভব। তা ছাড়া টেকসই উন্নয়ন করতে হলে আমাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণসহ আরো সুদূরপ্রসারী বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রশ্ন ১২। জীববৈচিত্র নষ্ট হবার জন্য শুধু কি মানুষই দায়ী, না আরো অন্যান্য কারণও এর আছে।

উত্তর: জীবপ্রজাতির কিছু বিলুপ্তি বিবর্তনের সাধারণ নিয়মেই ঘটে, সেখানে মানুষের কিছু করার নাই। তাছাড়া সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কারণে অতীতে প্রচুর জীব বিলুপ্তি ঘটেছে, এখনো ঘটছে। ঘুর্ণিঝড় সিডরে উপকূল এলাকায় জীব বসতের মারাত্মক সব ক্ষতি হয়েছে যার ধাক্কা সামলাতে বহু বছর লেগে যাচ্ছে। এগুলোও জীববৈচিত্র নষ্ট হবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কিন্তু আমরা জীববৈচিত্রের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে বড় সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি– সেটি মানুষের কারণেই ঘটছে। এর প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ক্ষমতা মানুষের হাতেই রয়েছে।

প্রশ্ন ১৩। অতীতে যে গণ-বিলুপ্তিগুলো ঘটেছিল তার প্রত্যেকটিতে জীব প্রজাতির একটি বড় অংশ বিলুপ্ত হয়ে গেলেও, এরপর আবার নূতন জীববৈচিত্রের সমারোহ এসেছিল। তা হলে আমরা এখন বিলুপ্তিকে এত ভয় কেন করছি?

উত্তর: অতীতে গণ-বিলুপ্তির ধাক্কা জীবজগৎ কাটিয়ে উঠেছে, এটি ঠিক। এমনকি এসব বিলুপ্তি অন্যদের জন্য ভাল সুযোগ এনে দিয়েছে, এটিও ঠিক। কিন্তু বিলুপ্তির পর সব কিছু পড়ে গিয়েছে দারুণ অনিশ্চয়তায়। যারা বিলুপ্ত হলো এটি তাদের জন্য তো দুঃসংবাদতো বটেই, যারা কোন রকমে বেঁচে রইলো তাদের উপরও এই বিলুপ্তি বহুদিনের জন্য প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে রাখে ও তাদের জীবনকেও অনিশ্চিত করে তুলে। অতীতের গণ-বিলুপ্তিতে ওদেরকেও একটি দারুণ সংকটের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। এ সংকটে বাঁচলে তবেই তাদের কারো কারো ভাল সুযোগের প্রশ্ন আসে। তাই বর্তমান যে বিলুপ্তি তাতে আমরা সহ বাকিদের জন্যও দারুণ সংকটের সৃষ্টি করবে। ক্ষীয়মান জীববৈচিত্রের মধ্যে আমাদের ভবিষ্যতও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। উদ্বেগ সে জন্যই।

প্রশ্ন ১৪। যাদুঘরে সংরক্ষিত নমুনা থেকে বা ফসিল থেকে অবিকৃত ডিএনএ পাওয়া গেলে আধুনিক জিন প্রযুক্তির সহায়তায় বিলুপ্ত প্রাণিকে পুনরুদ্ধার করতে

পারার একটি সম্ভাবনা ভবিষ্যতে রয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো অতীতের এরকম বিলুপ্ত প্রাণিকে পুনরুদ্ধার করে পুনর্বাসন করা আদৌ উচিত হবে কিনা। আজকের বিশ্বে তো তাদের উপযুক্ত পরিবেশ নাই, তাই বর্তমান জীববৈচিত্রের ক্ষেত্রে তারা একটি উপদ্রবও হতে পারে। যেমন সম্ভব হলেও ডাইনোসরকে ফিরিয়ে আনা কি উচিত হবে?

উত্তর: এটি একটি কাল্পনিক প্রশ্ন, কারণ ওভাবে ডিএনএ'র মাধ্যমে বিলুপ্ত প্রাণির পুনরুদ্ধার এখনো ভবিষ্যতের সম্ভাবনার পর্যায়ে রয়েছে। আদৌ যদি এটি সম্ভব হয়, তা হবে অপেক্ষাকৃত সদ্য বিলুপ্ত প্রাণিদের ক্ষেত্রে। এরকম সদ্য বিলুপ্ত প্রাণিদের জীব-পরিবেশ এখনো বর্তমান রয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের খুব কাছাকাছি রকমের প্রজাতি, খুব সম্ভব একই গণের (জেনাস) প্রজাতি এখনো বেঁচে রয়েছে, এবং তাদের সহায়তা গ্রহণ করেই এই পুনরুদ্ধারের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে ওরা ফিরে আসলে এবং পুনর্বাসনের সময় সতর্ক হলে আজকের প্রকৃতিতে তাদের না মিশে যেতে পারার কোন কারণ নাই। সুদূর অতীতের বিলুপ্ত প্রাণিদের ক্ষেত্রে ভাল ডিএনএ পাওয়ার সুযোগ নাই, পুনরুদ্ধারের অন্যান্য সুযোগগুলোও নাই, ডাইনোসরের ক্ষেত্রে তো নয়ই।

প্রশ্ন ১৫। বিশ্বব্যাপী জীববৈচিত্রের মেগাকরিডর গড়ে উঠলে বর্তমান পৃথিবীর জীব বন্টনের ভারসাম্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে না তো? নানা কারণে এক অঞ্চলের প্রাণি অন্য প্রতিকূল অঞ্চলে গিয়ে বিপদে পড়তে পারে, সেখানকার জীববৈচিত্রের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এমন হবার আশংকা কতখানি?

উত্তর: আসলে যে পথে নানা প্রাণির স্বাভাবিক অভিভাবসন রয়েছে, বা বসত টুকরা হয়ে যাওয়ার আগে ছিল, সেখান দিয়েই মেগাকরিডরগুলো গড়ে তোলা হচ্ছে। কাজেই এরকম যাতায়াতে কোথাও জীববৈচিত্রে অসুবিধা দেখা দেয়ার কথা নয়। তাছাড়া প্রাণির যাতায়াতের বড় মাপের সুবিধা থাকলেও ওরা নিজেদের সনাতন আবাসেই থাকা পছন্দ করে যতক্ষণ তাদের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় যাতায়াতের গণ্ডি বজায় থাকে। যোগাযোগের ব্যবস্থাটা থাকলে প্রয়োজনে সেটি ব্যবহৃত হতে পারে, এতে জীববৈচিত্রের সুবিধাই হয়।

প্রশ্ন ১৬। মনে হচ্ছে বিশ্ব সমাজ এখন জীববৈচিত্রের জন্য সংরক্ষিত এলাকা গড়ে তোলার উপরই বেশি জোর দিচ্ছে। এর জন্য লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে ১৫% এলাকাকে। তার মানে কি এই যে বাকি ৮৫% জায়গায় আমরা জীববৈচিত্রের কথা না ভেবে যা ইচ্ছা তাই করতে পারি?

উত্তর: সংরক্ষিত এলাকা গড়ার লক্ষ্য তা নয়। ওসব এলাকায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে আমাদের হস্তক্ষেপের বাইরে নানা জীবের প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় থাকবে। তাই এগুলো একটি বড় অবদান জীববৈচিত্রের ক্ষেত্রে রাখবে। কিন্তু জীবের বসবাস থাকবে বাকি সব জায়গাতেও মানুষের সঙ্গে সহঅবস্থানে। খুব নিভৃতচারী জীব ছাড়া বাকি সবাই মানুষের কাছাকাছি জায়গাতে ভালই থাকতে পারে যদি আমরা তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলোর কথা মনে রাখি। এমনকি একটি মহানগরীর পার্ক, ঝোপ ঝাড়, রাস্তার দুপাশের বৃক্ষবীথি সব মিলে অনেক পাখি, অনেক বৃক্ষচারী এবং অনেক অন্যান্য প্রাণির বাস থাকতে পারে। এমনটিও হতে পারে যদি আমরা সে মহানগরীতে সেরকম সুযোগ রাখি। ছোট ছোট শহর, শহরতলী বা পল্লী অঞ্চলের ক্ষেত্রে তো জীববৈচিত্রের আরো বড় সমারোহ ঘটতে পারে। সংরক্ষিত এলাকা গড়া মোটেই এসব উদ্যোগের বিকল্প নয়।

ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণে এবং দেশের তরুণ তরুণীদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক করার ক্ষেত্রে একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। এজন্য তিনি লেখালেখি, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যবহার, বিজ্ঞান সাংবাদিকতা, বিজ্ঞান বক্তৃতা ইত্যাদি সব মাধ্যম ব্যবহার করেছেন গত পাঁচ দশক ধরে। 'মহাশূন্যে মানুষ' এই পুস্তকমালাটিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেয়া তাঁর একটি বিজ্ঞান বক্তৃতামালার ভিত্তিতেই রচিত। ষাটের দশকে তিনি এদেশের প্রথম জনপ্রিয় বিজ্ঞান মাসিক 'বিজ্ঞান সাময়িকী'র প্রতিষ্ঠা করেন, যা তাঁরই সম্পাদনায় এখনো প্রকাশিত হচ্ছে। সত্তরের দশকের শেষের দিকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন একটি অনন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র (সিএমইএস), নিজে কর্ণধার থেকে যাকে তিনি পল্লী-বাংলার সুবিধাবঞ্চিত তরুণ তরুণীদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা ও হাতে কলমে জীবিকামুখি প্রযুক্তির বিস্তারে একটি সুযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন।

বিজ্ঞান সাহিত্যের জন্য বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার সহ বিভিন্ন স্বীকৃতি প্রাপ্ত এই লেখকের লেখনী শুধু তাঁর নিজের বিষয় পদার্থ বিদ্যার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং আধুনিক বিজ্ঞানে অতি ফলপ্রসূ বিভিন্ন শাখার অগ্রগতি নিয়ে তাঁর বুঝিয়ে বলার প্রচেষ্টা ও লেখার স্বচ্ছন্দ গতি রয়েছে। তাঁর প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক বই এবং প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক। বাংলাদেশে বিজ্ঞান চেতনা, বিজ্ঞান সাহিত্য, তরুণ তরুণীদের সক্রিয় বিজ্ঞান আন্দোলন কী ভাবে এগিয়েছে, তাঁর সম্পাদিত 'বিজ্ঞান সাময়িকী'তে এবং তাঁর রচনায় তার একটি ধারাবাহিক আলেখ্য পাওয়া যায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক।